ম্যাক্সিম গর্কি

অমল দাশগুপ্ত

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৪

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৫

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্যাপিরাস -পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৪ কর্তৃক প্রকাশিত ও টেকনোপ্রিণ্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

ছোটোদের জন্য আমাদের জীবনী-সিরিজের সপ্তম গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হলো 'ম্যাক্সিম গর্কি'। এ-বই প্রথম ছাপা হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এর লেখক অমল দাশগুপ্ত এখন প্রয়াত। তাঁর স্বজনেরা বইটির পুনঃপ্রকাশে সম্মত হয়েছেন বলে তাঁদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

১

কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বলো তো, পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় লেখা যত উপন্যাস আছে তার মধ্যে কোন্ উপন্যাসটি সবচেয়ে বেশি লোক পড়েছে—তাহলে কী জবাব দেবে? সবচেয়ে বেশি লোক পড়া মানেই সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনুবাদ হওয়া আর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া। এমন কোন্ উপন্যাস আছে?

এই উপন্যাসটির নাম 'মা' আর এই উপন্যাসটির লেখকের নাম ম্যাক্সিম গর্কি।

'মা' ছাড়াও ম্যাক্সিম গর্কি আরো অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোটোগল্প ও প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। তবে তার চেয়েও বড়ো কথা হচ্ছে এই যে তিনি এমন এক সময়ে এই লেখাগুলি লিখেছেন যখন তাঁর নিজের দেশ রাশিয়ায় একটা বিপ্লব হয়েছিল। 'বিপ্লব' কথাটা তোমরা সবাই শুনেছ, কিন্তু কথাটার ঠিক মানে কী তা হয়তো অনেকেই বলতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যারা ভল্‌টেয়ারের জীবনী পড়েছ তারা ফরাসি-বিপ্লবের কথা নিশ্চয়ই জান। ফরাসি-বিপ্লবের ব্যাপারটা আসলে কী? সাধারণ মানুষ রাজার হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং নিজেদের মতো করে দেশকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। এই তো? অর্থাৎ একটা কিছুকে ভেঙে ফেলে আর একটা

কিছু গড়ে তোলা। আর এরই নাম বিপ্লব। আমাদের দেশে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে যে আন্দোলন হয়েছিল তাকে অনেকে বলে বিপ্লব। কিন্তু আসলে তা বিপ্লব নয়। সে-সময়ে দেশের মানুষ ইংরেজ রাজত্বকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু নতুন একটা কিছু গড়ে তুলতে পারেনি। তাই আগস্ট মাসের আন্দোলনটা আসলে বিপ্লব নয়—বিদ্রোহ। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লব ছাড়াও সত্যিকারের আরেকটা বিপ্লব হয়েছিল রুশদেশে ১৯১৭ সালে। এই বিপ্লবে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ তাদের জারকে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং নিজেরাই নিজেদের দেশকে নতুন করে গড়ে তোলে। একবার ভাবো তো দেখি, সাধারণ মানুষের কত বড়ো জোর থাকলে পরে দেশের রাজাকে তারা রাজ্যছাড়া করতে পারে? এই জোর কোত্থেকে এসেছিল জান? নাম করে বলা যায়, মাত্র দু-জন মানুষ তাদের মনে এই জোর এনে দিয়েছিলেন। একজন হচ্ছেন লেনিন এবং অপরজন ম্যাক্সিম গর্কি। লেনিন জোর এনেছিলেন নিজের একটা দল গড়ে তুলে, আর গর্কি জোর এনেছিলেন বই লিখে।

শুধু লেখার জোরে যদি একটা দেশের চেহারা বদলে দেবার মতো অবস্থা তৈরি করা যায়—তাহলে একবার ভাবো তো সেই লেখার কত জোর! এমনি জোরালো লেখা লিখতে পেরেছেন বলেই ম্যাক্সিম গর্কি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। তিনি কতগুলি উপন্যাস আর কতগুলি গল্প লিখে-

ছেন সে-হিসাব কেউ করতে বসবে না। চিরকাল সবাই মনে রাখবে যে এমন লেখা তিনি লিখেছেন যা একটা গোটা দেশের মানুষকে বিপ্লবের জন্যে তৈরি করেছে।

২

ম্যাক্সিম গর্কির আসল নাম আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশ্‌কভ। সবাই ডাকে আলয়োশা বলে।

বাবার কথা ভাবতে বসলে আলয়োশার চোখের সামনে একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে।

আস্ত্রাখান শহরে ছোট্ট ঘুপ্‌সি একটা ঘর। জানলার ঠিক নিচেই আগাগোড়া শাদা পোশাক পরিয়ে আলয়োশার বাবাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আর বাবার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন আলয়োশার মা।

আলয়োশার একটা হাত ধরে আছেন আলয়োশার দিদিমা। তিনি বারবার বলছেন, যাও বাছা বাবাকে শেষ দেখা দেখে নাও।

আলয়োশার বয়স তখন চার বছর। দিদিমার সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা। সবে সে খুব একটা শক্ত অসুখ থেকে উঠেছে। অসুখের প্রথম দিকে বাবাই দেখতে আসতেন তাকে। তারপর বাবা পড়লেন অসুখে। তখন নিঝনি-নভ্‌গোরোদ থেকে এলেন আলয়োশার দিদিমা। তিনি এসেই এই চার বছরের শিশুটির মন জয় করে নিলেন।

আর এই একই দিনে আর একটি ঘটনা ঘটে। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশেই আলয়োশার ছোটো ভাইটির জন্ম হয়। অল্প কয়েক দিন মাত্র এই ছেলেটি বেঁচেছিল।

বাবার কথা ভাবতে বসলে তারপরে আলয়োশার মনে পড়ে এক বর্ষার দিনের কথা। একটা পিচ্ছিল মাটির ঢিবির ওপরে আলয়োশা দাঁড়িয়ে আছে আর একটা গর্তের মধ্যে নামানো হচ্ছে তার বাবার কফিন। গর্তের তলায় জল জমেছে, ব্যাঙ লাফালাফি করছে – আর দুটো ব্যাঙ কফিনের হলদে ডালাটার ওপরে লাফিয়ে উঠেছে। তারপর কবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। ব্যাঙদুটো চাপা পড়ে যায় মাটির নিচে।

এই ব্যাঙদুটোর কথা বহুদিন আলয়োশা ভুলতে পারেনি।

সমাধিস্থান থেকে বেরিয়ে এসে দিদিমা আলয়োশাকে বললেন, হ্যাঁ রে তুই কাঁদছিস না কেন? একটুখানি কেঁদে নে।

আলয়োশা বলল, আমার কান্না পাচ্ছে না দিদিমা।

শান্তস্বরে দিদিমা বললেন, ঠিক আছে, যদি কান্না না পায় তো কাঁদিস নে।

আলয়োশা সাধারণত কাঁদে না। শরীরে ব্যথা পেলে তার কান্না আসে না। আবার কেউ একটু আদরের কথা বললে বা অন্য কারও কষ্ট দেখলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

কাদা-প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে আলয়োশা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দিদিমা ব্যাঙগুলো কি বেরিয়ে আসতে পারবে না?

দিদিমা জবাব দেন, না পারবে না।

এই প্রশ্ন আবার আলয়োশা জিজ্ঞেস করেছিল জাহাজের

এক নাবিককে। বাবা মারা যাবার পরে আস্ত্রাখানের বাড়ি উঠিয়ে দিয়ে আলয়োশা আর তার মা ফিরে চলেছে নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে। সেখানে আলয়োশার দাদামশাই আছেন, মামা-মামিরা আছে, আর আছে অনেক মামাতো ভাইবোন। আলয়োশার ছোটো ভাইটি জাহাজের কেবিনেই মারা যায়। সারাতভ নামে একটা শহরে এসে আলয়োশার মা আর দিদিমা জাহাজ থেকে নেমে যান বাচ্চাটিকে কবর দেবার জন্যে। আলয়োশাকে রেখে যাওয়া হয় কেবিনে। নীল-পোশাক-পরা একজন নাবিকও থাকে।

আলয়োশা নাবিকটিকে জিজ্ঞেস করে, দিদিমা কোথায় গেল ?

নাবিকটি বলে, নাতিকে কবর দিতে।

— ওকে কি মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হবে ?

— নিশ্চয়ই।

তখন আলয়োশা সেই ব্যাঙছুটোর কথা জিজ্ঞেস করে। শুনে সেই নাবিকটি আলয়োশাকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে চুমু খায় আর বলে, খোকন আমার, তুমি এখনো কিছু বুঝতে পারনি। ব্যাঙের জন্যে অত দরদ দেখাবার দরকার নেই — ব্যাঙের দল চুলোয় যাক। তোমার মা-র অবস্থা দেখতে পাচ্ছ তো ? শোক পেয়ে তিনি কী হয়ে গেছেন !

মা-র অবস্থা সম্পর্কে তখনো আলয়োশার কোনো ধারণা ছিল না। পরে সে বুঝতে পেরেছিল, বাবার মৃত্যুর

পরে মা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলেন। শোক করবার মতো মনের অবস্থাও তাঁর তখন ছিল না।

আলয়োশার মা এমন এক সময়ে বাপের বাড়িতে ফিরে চলেছেন যখন তাঁর ভাইরা অর্থাৎ আলয়োশার মামারা বিষয়সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার দাবি তুলেছে। আলয়োশার মা বিয়ে করেছিলেন বাপের অমতে সুতরাং আলয়োশার দাদামশাই সেই বিয়েতে এক পয়সা যৌতুক দেননি। আলয়োশার দুই মামা এখন দাবি তুলেছে, এই যৌতুকের টাকাও তাদের মধ্যেই ভাগ করে দিতে হবে। বাড়িতে যখন বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এত বেশি ঝগড়াঝাঁটি চলছে ঠিক সেই সময়ে সেই বাড়িতেই ফিরে যেতে হচ্ছে বলে আলয়োশার মা খুশি নন।

আলয়োশার দাদামশাইয়ের সম্পত্তি বলতে ছিল একটা রঙের কারখানা আর একটা বাড়ি আর কিছু জমানো টাকা। নিচু একতলা বাড়ি, ময়লা-ময়লা লালচে রঙ, জানলাগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে আর বাড়ির ছাদটা নিচু হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জানলাগুলোর ওপরে। ঘরগুলো ছোটো ছোটো আর অন্ধকার। উঠোনে রঙগোলা বড়ো বড়ো গামলা। কোণের একটা চালাঘরে আগুন জ্বলছে আর চিড়-বিড় শব্দে সেদ্ধ হচ্ছে কী যেন।

দেখেশুনে বাড়িটাকে আলয়োশার একেবারেই পছন্দ হলো না। তেমনি পছন্দ হলো না বাড়ির মানুষগুলোকে।

আলয়োশার দাদামশাই ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের কটা চোখ, লাল দাড়ি। আর হাতের চামড়া রঙে খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে হাতদুটোকে রক্তমাখা বলে মনে হয়। বাড়ির বাচ্চাগুলোকে ধরে তিনি কারণে অকারণে বেদম প্রহার দেন। আর অন্য সমস্ত বিষয়ে তাঁর এত বেশি খুঁত-খুঁতোনি আর এমন বিশ্রী শাসানি যে প্রথম দিন থেকেই আলয়োশা বুঝতে পারল যে এই লোকটিই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

ওদিকে মামারা দিনরাত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সর্দার কারিগর গ্রিগরি ইভানোভিচ আর শিক্ষানবিশ সিগানক কারো সাতে-পাঁচে থাকতে চায় না। কিন্তু এই দুটি নিরীহ মানুষকেও মামাদের হাতে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। এমনকী মামিমারা পর্যন্ত রেহাই পায়না, মামারা তাদের ওপরে পর্যন্ত মারপিট চালায়।

এই বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আলয়োশাকে বেদম প্রহার খেতে হলো দাদামশাইয়ের হাতে। শেষ পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল না এবং তারপরেও বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

এই বিছানায় পড়ে থাকার কয়েকটা দিন আলয়োশার জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছে। মানুষের বাইরের চেহারাটাই যে সব নয়, যে-কোনো মানুষকেই যে আপন বলে কাছে টানতে পারা যায়—এই শিক্ষা আলয়োশা পেয়েছিল এই

সময়ে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একদিন আলয়োশা শোনে, তার মা ও দিদিমার মধ্যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছে।

দিদিমা বলেন, ছেলেটাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেললে, তবুও তুই ছিনিয়ে আনতে পারলি না? অ্যাঁ?

—আমার ভয় করছিল।

—এত বড়ো হয়েও তোর ভয় করে! ছি, ছি, ভারভারা! আমি বুড়ি হয়েছি কিন্তু আমি ভয় পাইনি। ছি, ছি!

—আমাকে তোমরা একটু রেহাই দাও মা। এসব আমার ভালো লাগে না।

দিদিমা বলেন, ছেলেটার জন্যে তোর একটুও ভালোবাসা বা দরদ নেই। আহা, বাপ-মরা অনাথ ছেলে!

যন্ত্রণাভরা গলায় মা চেঁচিয়ে ওঠেন, আমি নিজেও তো একজন অনাথিনী। বাকি জীবনে আমার আর কী আছে!

ঘরের কোণে ট্রাঙ্কের ওপরে বসে দুজনেই কাঁদেন।

মা বলেন, আলয়োশা যদি না থাকত তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যেতাম। এই নরকে আমি আর থাকতে পারি না। এই জায়গা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, মা! এখানে থাকবার মতো মনের জোর আমার নেই।

দিদিমা ফিসফিস করে বলেন, আহা, বাছা রে আমার!

আলয়োশার মা তারপর আর বেশিদিন এই বাড়িতে

থাকেননি। কোথায় যেন বেড়াতে গিয়ে বহুদিন তিনি বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসেন। ফিরে এসে বিয়ে করেন আবার। কিন্তু বিয়ে করেও তিনি সুখী হতে পারেননি।

আলয়োশার এই অসুখের সময় একদিন তাকে দেখতে আসেন তার দাদামশাই। আর আলয়োশার বিছানার পাশে বসে কত রকম গল্প যে বলেন তিনি! ছেলেবেলায় তিনি ভল্‌গা নদীর ওপর দিয়ে বজরা টেনে নিয়ে যেতেন। জলের ওপরে বজরা, তিনি ডাঙায়—খালি পায়ে ছুঁচলো পাথর আর ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলা। এইভাবে তিন-তিনবার লম্বালম্বি ভল্‌গা নদী পাড়ি দিয়েছেন।

এই সময়ে শিক্ষানবিশ সিগানকের সঙ্গেও আলয়োশার খুব ভাব হয়ে যায়। শক্তসমর্থ চেহারা ছেলেটির, চওড়া কাঁধ মস্ত মাথা আর একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। পরনে মধু-রঙা সিল্‌কের শার্ট, পশমদার কাপড়ের ঢিলে ট্রাউজার, পায়ে মশমশে বুটজুতো। মাথার চুল চকচক করে, ঘন ভুরুর নিচে কৌতুকভরা চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের ওপরে সবে কালো রেখা দেখা দিয়েছে। ঝকঝকে শাদা দাঁত।

সিগানককে আলয়োশা জিজ্ঞেস করে, দাদামশাই কি আবার আমাকে মারবে নাকি রে?

সিগানক শান্তভাবে জবাব দেয়, ভাবছিস কী তুই? আলবত মারবে। এবার থেকে মাঝে মাঝে এটা তোর কপালে আছে ধরে রাখ।

—ইস্, শুধু শুধু মারলেই হলো ?

—শুধু শুধু কেন হতে যাবে ? তোর দাদামশাই যে করে হোক, একটা না একটা ছুতো বার করে নিতে পারবে।

আর হয়ও তাই। তারপর থেকে প্রায়ই কারণে অকারণে মার খেতে হয় আলয়োশাকে।

দাদামশাই বলেন, ছ্যাখ, বাড়ির লোকরা যদি তোকে পিটুটি দেয় তবে সেটা তোর ভালোর জন্যেই। ওতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু খবরদার, বাইরের লোককে কক্ষনো গায়ে হাত তুলতে দিবিনে।

দাদামশাইয়ের এই একটি কথা আলয়োশা সারা জীবনে ভোলেনি।

আর সিগানক ছেলেটা অদ্ভুত। দাদামশাই আলয়োশাকে প্রহার দিতে শুরু করলেই সে এগিয়ে এসে নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আলয়োশাকে বাঁচায়। আবার পরদিন নিজের ফুলে-ওঠা আঙুলগুলো আলয়োশার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নালিশ জানায়, দূর, দূর, তোকে আর আমি কোনো দিন বাঁচাতে চেষ্টা করব না। ছ্যাখ তো আমার কী অবস্থা হয়েছে।

কিন্তু দেখা যায়, পরের বারেও নিজে কোনো দোষ না করেও আলয়োশার প্রাপ্য শাস্তি সে হাত পেতে নিচ্ছে।

সিগানক ছিল কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। জন্মের পরেই ওর মা ওকে রাস্তায় ফেলে চলে যায়। ওকে মানুষ করেন আলয়োশার দিদিমা। আলয়োশার দাদামশাই ওকে বিশেষ-

ভাবে পছন্দ করেন ওর হাত-সাফাইয়ের জন্যে। পাঁচ রুবল দিয়ে ওকে বাজার করতে পাঠালে ও প্রায় পনেরো রুবলের জিনিস নিয়ে ফিরে আসে। দিদিমা এজন্যে বকাবকি করেন কিন্তু তাঁর একার কথায় কেউ কান দেয় না।

আলয়োশাকে দিদিমা প্রায়ই বলেন, আলয়োশা এ যেন অন্ধ বুড়ির হাতে বোনা একটা ফিতে। আগাগোড়া জট পাকিয়ে গেছে, আসল নক্‌শাটাকে কিছুতেই চেনা যাবে না। ভেবে ছ্যাখ দেখি, একবার যদি ও চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মারতে মারতে ওকে খুন করে ফেলবে···

কিন্তু সিগানককে শেষ পর্যন্ত খুন হতে হয় আলয়োশার মামাদের হাতে। সিগানককে তারা ত্ব-চোখে দেখতে পারত না। শেষকালে একদিন সুযোগ পেয়ে আলয়োশার তুই মামা চক্রান্ত করে সিগানককে খুন করে।

৩

আলয়োশা মামাবাড়িতে আসার পর এক বছরও কাটল না। সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেল। ইয়াকভ-মামা রয়ে গেল শহরে, মিখাইল-মামা গেল নদী পেরিয়ে। দাদামশাই পলেভয় স্ট্রিটে একটি চমৎকার নতুন বাড়ি কিনলেন। বাড়িটার দোতলায় ছিল একটা মদের দোকান আর ছাদের ওপরে ভারি চমৎকার একটি ঘর। বাড়িটার সামনের দিকে একটা বাগান, বাগান পেরিয়ে একটা পাহাড়ে খাদ। চারদিকে ন্যাড়া ন্যাড়া উইলো গাছ।

ছাদের ঘর থেকে বাইরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে একটা ধুলোভরা রাস্তা। বাঁ দিকে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে অস্ত্রোঝ্নায়া স্কোয়্যারে। তার পাশে পুরোনো জেলখানা। ডান দিকে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে সেনায়া স্কোয়্যারে। তার পাশে জেলকর্মচারীদের ব্যারাক। এই সেনায়া স্কোয়্যারেই সবুজ-শ্যাওলা-ঢাকা একটা পুকুর আছে। নাম, ডুকভ পুকুর। দিদিমার কাছে আলয়োশা গল্প শুনেছে, এই ডুকভ পুকুরে একবার তার বাবার জীবনান্ত হতে বসেছিল।

আলয়োশার মা নতুন বাড়িতে আসার আগেই কোথায় যেন চলে গেছেন। অনেক দিন পর-পর এক-একবার আসেন, ডু-একদিন থেকেই আবার চলে যান।

ওদিকে দিদিমা পাড়াপড়শিদের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে

নিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারে সবাই তাঁর কাছে আসে পরামর্শ নেবার জন্যে। আর আলয়োশা লেখাপড়া করতে শুরু করেছে। দাদামশাই তাকে স্তোত্রের বই থেকে অক্ষর চেনান। তবে মাঝে মাঝে এক একদিন পড়াতে পড়াতে বইপত্র ঠেলে সরিয়ে রেখে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠেন : দাদু তোর মা-র কি একটুও দরদ নেই রে ! নইলে এমন ছেলেকে ফেলে চলে যায় !

দিদিমা রাগ করেন : আবার এসব কথা কেন তুলছ ! কিছু লাভ আছে !

কিন্তু এসব কথায় আলয়োশা বিশেষ কান দেয় না। তার মন পড়ে থাকে বাইরে।

শেষকালে এক সময়ে দাদামশাই বলেন, যা এবার বাইরে একটু খেলা কর গিয়ে। কিন্তু খবরদার রাস্তায় যাবি নে।

কে কার কথা শোনে ! আলয়োশা একছুটে একেবারে উঁচু রাস্তার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকের ঝোপঝাড় থেকে ছেলের দল চিৎকার করতে থাকে : টুস্‌কা ! ওরে টুস্‌কা !

আলয়োশা কিন্তু রাগ করে না। শত্রুবাহিনীকে তাক্ করে ইট ছুঁড়তে শুরু করে। শত্রুর দলও সমান তৎপর। শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড এক লড়াই। ভারি মজা লাগে আলয়োশার।

এক-একদিন দাদামশাই পুরোনো দিনের সব গল্প বলতে শুরু করেন। সেই ১৮১২ সালের কথা। নেপোলিয়ন রুশ-

দেশ আক্রমণ করেছিল। বন্দী হয়েছিল অনেক ফরাসি সৈন্য। একদল বন্দী ফরাসিকে আটক রাখা হয়েছিল দাদামশাইদের গ্রামে। অদ্ভুত সব কাহিনী। দাদামশাই আজকাল কথায় কথায় আলয়োশাকে বেতমারা বন্ধ করেছেন। চোখের ওপরে নিজের ছেলেমেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে মাঝে মাঝে কেমন হতাশ হয়ে পড়েন তিনি আর নিজের ওপরেই রেগে ওঠেন।

—ছেলেমেয়েগুলো সব অপোগণ্ড হয়েছে। একটাও যদি কোনো একটা দিকে ভালো হতো।

আপন মনেই বিড়বিড় করে চলেন আর দিদিমাকে শাসান : তোমার দোষেই ছেলেমেয়েগুলো উচ্ছন্নে গেছে!

তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন দিদিমা।

একদিন আলয়োশার চোখের ওপরে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এমনি এক উত্তেজনার সময়ে দিদিমা গিয়েছিলেন দাদামশাইকে শান্ত করতে। হঠাৎ দাদামশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে দিদিমার মুখের ওপরে দুম করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বসলেন। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল দিদিমার মুখ থেকে।

সেদিন রাত্রিবেলা বিছানায় শোবার পরেও কিছুতেই আলয়োশার চোখে ঘুম এল না। কী যেন একটা দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে জানলার কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়। বাইরে জনশূন্য রাস্তা। অসহ্য এক যন্ত্রণায় বোবা হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে আলয়োশা।

৪

এদিকে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।

মামারা সব আলাদা হয়ে গিয়েছিল। একদিন হঠাৎ ইয়াকভ-মামা এসে খবর দেয় যে মিখাইল-মামা নাকি মাতাল অবস্থায় আলয়োশার দাদামশাইকে খুন করতে আসছে।

তারপর সত্যি-সত্যিই মিখাইল-মামা এসে হাজির। তবে একা এসেছিল, কাজেই অতগুলো লোকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। বেদম মার খেয়ে ফিরে যায়। কিন্তু তার-পর থেকে আসতে শুরু করে দলবল নিয়ে। হাতের সামনে যা কিছু পায় ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। বন্ধ দরজার পিছন থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে আলয়োশার দাদামশাই শুধু অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখেন।

দেখতে দেখতে চারদিকে বাড়িটার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় প্রতি রবিবার রাস্তার ছেলেগুলো এই বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে চিৎকার করে: ওরে, আয় রে আয়, কাশিরিনদের বাড়িতে আবার মারামারি শুরু হয়েছে!

আলয়োশা কিন্তু 'কাশিরিন' নয়, সে হচ্ছে 'পেশ্‌কভ'। সুযোগ পেলেই এ-কথাটা সে সবাইকে শুনিয়ে রাখে। কেউ তাকে 'কাশিরিন' বলে ডাকলে মাথায় রক্ত উঠে আসে তার। পাড়ার ছেলেগুলোও তেমনি। আলয়োশাকে দেখতে পেলেই সবাই মিলে চিৎকার করতে থাকে:

—ওই আসছে রে! কাশিরিন কিপটের নাতি আসছে : ছাখ! ছাখ!

—দে না ঘুষি মেরে ফেলে!

তারপরেই শুরু হয়ে যায় মারামারি। বয়সের তুলনায় আলয়োশার গায়ে অস্বাভাবিক জোর, তাই শত্রুপক্ষ একা আসে না। দল বেঁধে এসে তাকে বেধড়ক মেরে যায়। আলয়োশা বাড়ি ফেরে কাটা নাক, কাটা ঠোঁট ও ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে।

শুধু এইজন্যেই নয়, আরো নানা কারণে পাড়ার ছেলে-দের সঙ্গে আলয়োশার মারামারি হয়। ওরা কুকুর আর মোরগে লড়াই লাগিয়ে দেয়, ভেড়ার পালকে তাড়া করে, রাস্তার পাগলের পিছনে লাগে। আর এইসব নিষ্ঠুরতা আলয়োশা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।

আর এই রাস্তা দিয়েই মাঝে মাঝে গ্রিগরি ইভানোভিচ ভিক্ষে করতে বেরোয়। দাদামশাইয়ের রঙের কারখানার সর্দার কারিগর ছিল এই লোকটি। সারাটা জীবন সে পাত করেছে এই কারখানাকে বড়ো করবার জন্যে। কিন্তু বুড়ো বয়সে অন্ধ হয়ে যাবার পর চাকরি গেছে তার। এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ানো ছাড়া গতি নেই। আলয়োশা এই দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ছুটে পালিয়ে আসে দিদিমার কাছে আর জিজ্ঞেস করে : দাদামশাই কেন গ্রিগরির খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করেন না?

দাদামশাই ? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দিদিমা বললেন, এই আমি তোকে বলে রাখছি—মনে রাখিস কথাগুলো। কাজটা ভালো হচ্ছে না। ভগবানের শাস্তি পেতে হবে এজন্যে। অতি ভয়ংকর হবে সেই শাস্তি !

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। তারপরে দশ বছরও পার হয়নি। আলয়োশার দাদামশাইকেও ঠিক এমনিভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়েছিল।

৫

পলেভয় স্ট্রিটের বাড়িতে দাদামশাই মাত্র এক বছর ছিলেন। তারপরেই হঠাৎ মদের দোকানের মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলেন বাড়িটা। নতুন আর-একটা বাড়ি কিনলেন কানাৎনায়া স্ট্রিটে।

পুরোনো বাড়ির চেয়ে নতুন বাড়িটা আরো সুন্দর, আরো পরিপাটি, আরো চকচকে। সামনের দিকে ভারি সুন্দর বাগান। চারদিকে ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম, দেবদারু ও লাইম-গাছ। একটা কোণের দিকে ছিল আগাছায় ভরা চওড়া একটা গর্ত। এই জায়গাটাকে পরিষ্কার করে আলয়োশা ভারি সুন্দর একটা কুঞ্জ তৈরি করেছিল।

নতুন বাড়িতে আসার পর তিনটি ঘটনা ঘটে। 'বাঃ বেশ' নামে একটি লোকের সঙ্গে আলয়োশার আলাপ হয়। আলয়োশার মা ফিরে আসেন। আলয়োশার বসন্ত হয় আর এই অসুখের সময়েই সে দিদিমার কাছে বাবার গল্প শোনে।

'বাঃ বেশ' লম্বা ও কুঁজো। কালো দাড়ি, ফ্যাকাশে মুখ, চোখে চশমা। আর আসল নাম কেউ জানে না, সবাই তাকে ডাকে 'বাঃ বেশ'। তার কারণও আছে। 'বাঃ বেশ' কথাটা তার মুখে সব সময়ে শোনা যায়। হয়তো কেউ খাবার জন্যে ডাকতে এসেছে, সে বলবে 'বাঃ বেশ'। যে যে-

কথাই বলুক না কেন, তার মুখে সেই এক জবাব—'বাঃ বেশ'। শেষকালে তার নামই হয়ে গেল 'বাঃ বেশ'।

বাড়ির পিছনদিকে রান্নাঘরের পাশে লম্বা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে। ঘরটা ঠাসা রয়েছে কাঠের বাক্স আর মোটা মোটা বইয়ে। তাছাড়াও চারদিকে ছড়িয়ে আছে নানা রঙের তরল পদার্থে ভর্তি বোতল, তামার টুকরো, লোহা আর সীসের চাঁই। জানলার বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে আলয়োশা দেখে, কখনো সে সীসে গলাচ্ছে, কখনো তামা ঝালাই করছে, কখনো খুদে খুদে নিক্তিতে কী যেন ওজন করছে। টেবিলের ওপরে সব সময়ে একটা অ্যালকোহলের বাতি জ্বলে। দেখে দেখে ভারি কৌতূহল হলো আলয়োশার।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। 'বাঃ বেশ' একমনে নিজের কাজ করে আর আলয়োশা চুপ করে বসে বসে দেখে।

একদিন আলয়োশা জিজ্ঞেস করল, তুমি কী তৈরি করছ?

সে বলে, একটা জিনিস তৈরি করছি ভাইটি।

—কী জিনিস?

—কী করে তোমাকে বলি! তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

—দাদামশাই বলেন, তুমি নাকি জাল টাকা তৈরি

করো।

'বাঃ বেশ' হেসে ওঠে : একটা কথা মনে রেখো ভাইটি, টাকা জিনিসটা এমন কিছু নয় যে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে।

কিন্তু 'বাঃ বেশ'কে বাড়ির অন্য কেউ পছন্দ করে না। দাদামশাই নয়, দিদিমা নয়। সবারই ধারণা, লোকটার কিছু একটা শয়তানি মতলব আছে। কিন্তু আলয়োশা যতই তাকে দেখে ততই মুগ্ধ হয়। এত বেশি সাধারণ জ্ঞান, চার-পাশের ঘটনাকে এমন খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা, আর মানুষের ওপরে এত বেশি দরদ এর আগে আলয়োশা আর কারও মধ্যে দেখেনি। আলয়োশা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না, 'বাঃ বেশ'কে কেন অন্য সবার এত বেশি অপছন্দ।

শেষ পর্যন্ত তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

একদিন সকালে আলয়োশা দেখে, 'বাঃ বেশ' নিজের ঘরে মেঝের ওপরে বসে বাক্সের মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে।

—ভাইটি, এবার তাহলে বিদায় দাও। আমি চলে যাচ্ছি।

আলয়োশার বুকের ভিতরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে থাকে।

—কেউ তোমাকে পছন্দ করে না কেন?

কথাটা শুনে সে আলয়োশাকে জোরে বুকের ওপরে

চেপে ধরে। তার চোখের পাতাদুটো কাঁপতে থাকে থরথর করে। বলে, কেন জান ভাইটি? আমি অন্য কারো মতো নই। অন্য কারো মতো নই আমি!

'বাঃ বেশ'-এর সঙ্গে তারপরে আর আলয়োশার কোনো দিন দেখা হয়নি। কিন্তু তার জীবনের এই প্রথম বন্ধুটির কথা সে চিরকাল মনে রেখেছে।

'বাঃ বেশ' চলে যাবার কিছুদিন পরেই আলয়োশার মা ফিরে আসেন। মা-র মুখটা যেন আরো ছোটো হয়ে গেছে, আরো ফ্যাকাশে। চোখগুলো আরো বড়ো। চুলগুলো আরো সোনালি। মা যেন এক ঝলক আলোর মতো। মা-র সামনে এ-বাড়ির সব কিছুকেই মনে হচ্ছে পুরোনো আর ময়লা। আর আলয়োশা নিজেও যেন দাদামশাইয়ের মতো বুড়ো হয়ে গেছে।

মা বলেন, এবার তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব।

আলয়োশা বলে, লেখাপড়া তো আমি শিখেছি।

—আরো অনেক শিখতে হবে। ইস্, কী দস্যি হয়েছিস রে তুই!

তারপরেই তিনি মহা উৎসাহে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই 'প্রথম পাঠ' শেষ হয়। কিন্তু মুশকিল বাধে কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে। আলয়োশা কিছুতেই কবিতার লাইনগুলো ঠিকমতো মনে রাখতে পারে না। কবিতা মুখস্থ বলতে গিয়ে কখন যে

আসল কবিতা ভুলে গিয়ে নিজের বানানো কবিতা বলতে শুরু করে তা নিজেও টের পায় না।

আলয়োশার মা ফিরে এসেছেন বলে দাদামশাই খুশি নন। মাঝে মাঝে তিনি চেরা গলায় চিৎকার করে ওঠেন: তুই আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছিস ভারকা! মা-ও যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকেন। তাঁর চোখের চারদিকে কালো দাগ পড়ে। চেহারার দিকে আর আগেকার মতো নজর থাকে না। চুল না আঁচড়ে একটা বোতামছেঁড়া জামা পরে ঘুরে বেড়ান সারা দিন। মা-কে এমন বিশ্রী চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে ভারি খারাপ লাগে আলয়োশার। মা থাকবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্ঝকে-তক্তকে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে! মা হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ!

বড়োদিনের ছুটির পরে আলয়োশাকে আর মিখাইল-মামার ছেলে সাশাকে স্কুলে ভর্তি করানো হলো। সাশা দু-তিন দিন স্কুলে যায়, তারপরেই স্কুল পালাতে শুরু করে। আলয়োশারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু মা-র কথা ভেবে নিজের মনের ইচ্ছাকে চেপে রাখে।

সাশা মাঝেমাঝে বলে, কী হবে লেখাপড়া করে? চলো না দুজনে একসঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে কোনো একটা ডাকাতদলের সঙ্গে যোগ দিই।

আলয়োশা বলে, না ভাই, মা বলেছে, আমাকে বড়ো হয়ে মস্ত অফিসার হতে হবে!

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে সাশা তার কথায় সায় দেয় : ঠিক আছে। তুই হবি অফিসার আর আমি হব ডাকাত-দলের সর্দার। তারপর হয় তুই মরবি, না হয় আমি মরব। কিংবা, হয় তুই ধরা পড়বি, না হয় আমি ধরা পড়ব। আমি কিন্তু কিছুতেই তোকে খুন করতে পারব না।

আলয়োশা বলে, আমিও তোকে খুন করতে পারব না।

প্রত্যেকবারেই এভাবে মতের মিল হবার পরে দুজনের আলোচনা শেষ হয়।

তারপর একদিন সকালে আলয়োশার সারা গা দিয়ে লাল লাল গুটি বার হলো। বুঝতে পারা গেল, আলয়োশাকে বসন্তরোগে ধরেছে। চিলকোঠার ঘরে দীর্ঘকাল আটক থাকতে হলো তাকে।

এই অসুখের সময়ে বাইরের লোকের মধ্যে এক দিদিমাই আসতেন। চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতেন শিশুর মতো আর অজস্র গল্প ও রূপকথা বলতেন। এই সময়েই একদিন কথায় কথায় দিদিমা বলতে শুরু করেন আলয়োশার বাবার গল্প। রুদ্ধ আগ্রহ নিয়ে আলয়োশা শোনে।

আলয়োশার বাবা ছিলেন এক সৈনিকের ছেলে। আলয়োশার ঠাকুর্দা সাধারণ সৈনিক হিসেবে জীবন শুরু করে পরে অফিসার হয়েছিলেন। কিন্তু কর্মচারীদের ওপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করার অপরাধে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

আলয়োশার বাবার ছেলেবেলাটা ছিল খুবই কষ্টের। বাবার শাসন অসহ্য মনে হওয়ায় কয়েক বার তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই আলয়োশার ঠাকুর্দা শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছেন আর নির্দয়ভাবে প্রহার করেছেন।

বাবার খুব ছোটো বয়সে ঠাকুমা মারা গেছেন আর বাবার যখন ন-বছর বয়েস তখন ঠাকুর্দা মারা যান। বাবার ধর্মবাপ পোষ্যপুত্র নেন তাঁকে। তিনি ছিলেন নিজে ছুতোর-মিস্ত্রি এবং এই কাজে আলয়োশার বাবাকেও তিনি ওস্তাদ করে তোলেন। ষোলো বছর বয়সে আলয়োশার বাবা আসেন নিঝনি-নভ্‌গোরোদে। তিনি যে কারখানায় কাজ করতেন, সেটি ছিল কোতালিখা স্ট্রিটে আলয়োশার দাদা-মশাইয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই।

একদিন আলয়োশার দিদিমা আর মা বাগানে বেড়াচ্ছেন; এমন সময়ে আলয়োশার দিদিমা দেখেন—একটি লোক বাগানের বেড়া টপ্‌কে তাঁদের দিকে আসছে।

লোকটি বরাবর দিদিমার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে বলে, আকুলিনা ইভানোভনা, আমি আপনার মেয়ে ভারিয়াকে বিয়ে করতে চাই।

এই লোকটিই হচ্ছেন আলয়োশার বাবা ম্যাক্সিম সাভা তেয়েভিচ। আর ভারিয়া হচ্ছেন আলয়োশার মা।

আলয়োশার দাদামশাইয়ের এ বিয়েতে মত ছিল না।

তিনি যথাসাধ্য বাধা দেন। কিন্তু দিদিমা সহায় ছিলেন; তাই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পরে নানা ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া গেল, আলয়োশার বাবা ম্যাক্সিম মানুষ হিসেবে খুবই খাঁটি। আলয়োশার মামাদের মতো তিনি স্বার্থপর নন এবং খাওয়া-পরার জন্যে নিজের আয়ের ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে চান।

আলয়োশার মামারা নানা কারণে ম্যাক্সিমকে দুচোখে দেখতে পারত না। শেষকালে একদিন ম্যাক্সিমকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। তখন শীতকাল, দুকভ পুকুরের ওপরে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। শুধু এক জায়গায় একটুখানি ফাঁক ছিল। আলয়োশার মামারা করে কী, একসঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ম্যাক্সিমকে সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। আর ম্যাক্সিম যতবার বরফের কিনার ধরে উঠতে চেষ্টা করেন, ততবার তাঁর পায়ে লাথি মারে আর তাঁর মাথা লক্ষ করে বরফ ছুঁড়তে থাকে। তারপর যখন মামাদের ধারণা হয় যে ম্যাক্সিমের পক্ষে আর উঠে আসা সম্ভব হবে না —তখন তারা চলে যায়।

ম্যাক্সিম কিন্তু সেবার বেঁচে গিয়েছিলেন। দু-হাতে ভর দিয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে আসেন জল থেকে। তারপর পুলিশের সাহায্য নিয়ে সোজা বাড়িতে।

পুলিশের সার্জেণ্টটি বারবার জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন, কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল? শান্ত স্বরে

ম্যাক্সিম জবাব দেন, কেউ না ! অন্ধকারে রাস্তা ঠাহর করতে না পেরে আমি নিজেই পড়ে গেছি।

ম্যাক্সিম যখন বাড়ি ফিরে এসেছিলেন তখন তাঁকে দেখে আলয়োশার মা আর দিদিমা চিনতে পারেননি। সারা শরীর নীল হয়ে গেছে, হাতের আঙুলগুলো থ্যাৎলানো— রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মাথার ওপরে শাদা শাদা বরফের মতো কী লেগে আছে যেন, কিন্তু সেগুলো কিছুতেই গলে পড়ছে না। পরে বোঝা যায় যে ওগুলো তাঁর মাথার চুল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একমাথা কালো চুল একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছিল।

তারপর সাত সপ্তাহ ম্যাক্সিম বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেননি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খালি কাঁদতেন আর বলতেন, ওরা কেন আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করল ? ওদের কাছে আমি কী অপরাধ করেছি।

সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই তিনি নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদ ছেড়ে আস্ত্রাখানে চলে যান এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে থাকার সময়ে ১৮৬৮ সালে আলয়োশার জন্ম হয়েছিল।

৬

বসন্তরোগ থেকে সেরে উঠবার পরে প্রথম যেদিন আলয়োশা নিচে নামতে পারে, সেদিনই তাকে এক মর্মান্তিক খবর শুনতে হয়।

আলয়োশার মা আবার বিয়ে করছেন।

ভারি মন খারাপ হয়ে যায় আলয়োশার। লোকজনের সঙ্গ ভালো লাগে না। একা একাই কাটিয়ে দেয় সারাদিন। এই সময়েই সে বাগানের একটা পোড়ো জায়গায় নিজের জন্যে ভারি সুন্দর একটা কুঞ্জ তৈরি করেছিল। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো, মা-কে গিয়ে বলে, মা তুমি বিয়ে কোরো না। আমি কাজ করে তোমার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বলা হলো না। মা-র বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরেই আলয়োশার মা আর সৎ-বাপ চলে গেলেন মস্কোতে। যাবার আগে আলয়োশাকে মা বললেন, আমরা শিগগিরই ফিরে আসব। তোর বাবা পড়াশুনো শেষ করে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই ফিরে আসব।

কথাটা শুনে ভারি অবাক লাগল আলয়োশার। যে-লোকের দাড়ি গজিয়ে গেছে তার আবার পড়াশুনো কী!

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আলয়োশার মা আর সৎ-বাপ। দিদিমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে

লাগলেন। শুধু দাদামশাই চোখের জল মুছে বিড়বিড় করে বললেন, ভালো হবে না···এ বিয়ের ফল কক্ষনো ভালো হবে না···

কানাৎনারা স্ট্রিটের বাড়িতে এক বছরও কাটল না। দাদামশাই আবার বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। একদিন সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে দিদিমার কাছে ঘোষণা করলেন খবরটা। বললেন, গিন্নি, তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এতদিন আমিই করেছি। কিন্তু আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবার থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে।

অবিচলিত স্বরে দিদিমা জবাব দিলেন, ঠিক আছে। তাই হবে।

একটা বদ্ধ গলির মধ্যে পুরোনো এক বাড়ির একতলার দুটি অন্ধকার ঘর ভাড়া নিলেন দাদামশাই। বাড়ির অধিকাংশ আসবাব বিক্রি করে দেওয়া হলো।

নতুন বাড়িতে আসার কিছুদিন পরেই আলয়োশার মা আর সৎ-বাপ ফিরে এলেন। আস্তে আস্তে জানা গেল আলয়োশার সৎ-বাপ জুয়া খেলে সমস্ত টাকা উড়িয়েছেন। এখন তাঁদের একেবারে নিঃস্ব অবস্থা।

তারপরে অবশ্য আলয়োশার সৎ-বাপ চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো চাকরিই তিনি রাখতে পারেননি। নিজের বদ খেয়ালের জন্যে বারবার তাঁকে চাকরি খোয়াতে

হয়েছে।

দ্বিতীয়বার বিয়ের পর আলয়োশার মা আর মাত্র দুটি বছর বেঁচে ছিলেন। দু-বছরে আলয়োশার দুটি ভাই হয়। দুজনেই এক বছর বয়েস পুরো হবার আগেই মারা গেছে।

শেষদিকে আলয়োশার মা-র ওপরে আলয়োশার সৎ-বাপ ভয়ানক দুর্ব্যবহার করতেন। আলয়োশার মনে আছে, একদিন কী একটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হবার পরে আলয়োশার সৎ-বাপ আলয়োশার মাকে মেরেছিলেন। সেদিন আর আলয়োশা নিজেকে সামলাতে পারেনি। টেবিলের ওপর থেকে একটা ছুরি তুলে নিয়ে সৎ-বাপকে লক্ষ করে ছুরি চালিয়েছিল। অল্পের জন্যে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

স্কুলের লেখাপড়া আলয়োশার যেটুকু হয়েছে—তাও এই দু-বছরের মধ্যেই। আলয়োশাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন আলয়োশার মা।

অদ্ভুত সাজপোশাকে স্কুলে যেতে হতো আলয়োশাকে। পায়ে থাকত মা-র একজোড়া জুতো, পরনে দিদিমার ব্লাউজের কাপড় কেটে তৈরি কোট, হলদে শার্ট আর লম্বা ট্রাউজার। এই অদ্ভুত সাজপোশাকের জন্যে ছেলেরা ওকে খেপাত আর ওর নাম রেখেছিল—রুইতনের টেক্কা।

স্কুলে আলয়োশার দৌরাত্ম্যেরও শেষ ছিল না। এজন্যে মাস্টারমশাইদের কম নাকাল হতে হয়নি।

বাইবেলের মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকেই আলয়োশাকে জিজ্ঞেস করতেন, পেশ্‌কভ তুমি বই এনেছ কি আননি? হ্যাঁ, বই।

মাস্টারমশাইয়ের কথা বলার ভঙ্গি নকল করে আলয়োশা জবাব দিত, না আনিনি, হ্যাঁ।

—হ্যাঁ মানে!

— না।

—যাও, বেরিয়ে যাও ক্লাশ থেকে!

আলয়োশাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু এক বিশপের চোখ পড়ে যায় তার ওপরে। তিনি স্কুলের গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে যান।

'বাইবেলের গল্প' বইটা কেনবার জন্যে আলয়োশা একদিন মা-র তহবিল থেকে একটা রুবল চুরি করে বসে। সেই রুবলটা দিয়ে 'বাইবেলের গল্প' ছাড়াও আরো দুটি বই কেনে সে। একটি হচ্ছে 'রবিনসন ক্রুসো' এবং অপরটি 'অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা'। পরদিন স্কুলে এসে টিফিনের সময় সকলে মিলে রূপকথার বইটি পড়তে শুরু করে। 'নাইটিংগেল' নামে একটা গল্পের শুরুটা ছিল এই রকম: চীন দেশে সব মানুষই চীনা, এমনকী সেখানকার সম্রাটও চীনা। এই এক লাইন পড়েই আলয়োশা মুগ্ধ হয়ে গিয়ে-
।

এদিকে আলয়োশার দাদামশাই ও দিদিমা এক অদ্ভুত

জীবন কাটাচ্ছেন। চায়ের পাতা থেকে শুরু করে ঠাকুরের আসনের তেলটুকুর খরচ পর্যন্ত দুজনকে ভাগাভাগি করে চালাতে হয়।

হয়তো চায়ের পাতা ভেজানো হয়েছে। দাদামশাই বলে ওঠেন, আরে রোসো রোসো দেখি কতটা চা ভিজিয়েছ?

তারপর চায়ের পাতাগুলো হাতের ওপর নিয়ে খুব সাবধানে একটি একটি করে পাতাগুলো গুনতে থাকেন। একই পাত্রে চা ভেজানো হয় বটে কিন্তু দুজনের চায়ের ভাগ যাতে সমান থাকে সেদিকে কড়া নজর রাখেন তিনি।

সৎ-বাপকে ছুরি নিয়ে তাড়া করার পর আলয়োশাকে মা-র কাছ থেকে চলে আসতে হয়েছে এ-বাড়িতে। এখানে এসে সে রোজগার করতে শুরু করে। রবিবার ভোরবেলা আর অন্যান্য দিন স্কুলছুটির পরে বেরিয়ে পড়ে একটা থলে নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হাড়ের টুকরো, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পেরেক ও কাগজ কুড়োয়। আধমণ ছেঁড়া ন্যাকড়ার বদলে পাওয়া যায় কুড়ি কোপেক, আধমণ হাড়ের টুকরোর বদলে দশ কোপেক। মাঝে মাঝে 'বালুচর' নামে একটা দ্বীপে সদলে অভিযান হয়। সেখানে কাঠের গুদাম আছে; পাহারা-ওলাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাঠ চুরি করে আনে।

সে-সময়ে ছোটোখাটো চুরিকে কেউ দোষের বলে মনে করত না। এমনকী বড়োদের চোখের ওপরেই বাচ্চারা লোকের পকেট কাটত। বড়োরাও সুযোগ-সুবিধা পেলেই

অপরের জিনিস তুলে নিয়ে আসত বাড়িতে। তারপরে, এসব কাজে কে কতটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তাই নিয়ে বড়াই করত নিজেদের মধ্যে।

আলয়োশার দাদামশাইয়ের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। যতই তিনি টানাটানির মধ্যে পড়ছেন—ততই নানা ব্যাপারে তাঁর নীচতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পাচ্ছে।

কিছুদিন পরে আলয়োশায় সৎ-বাপ চাকরি খুইয়ে কোথায় যেন চলে যান। কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে আল-য়োশার মা আবার চলে আসেন দাদামশাইয়ের বাড়িতে।

এই দাদামশাইয়ের বাড়িতেই আগস্ট মাসের এক রবি-বারের দুপুরে আলয়োশার মা-র মৃত্যু হয়। আর মা মারা যাবার কয়েকদিন পরেই দাদামশাই আলয়োশাকে ডেকে বলেন :

—শোনো আলেক্সি, তোমাকে এভাবে মেডেলের মতো আমি গলায় ঝুলিয়ে রাখব তা তো আর চলতে পারে না। এখানে আর তোমার জায়গা হবে না। এবার তোমার বাইরের দুনিয়াকে চিনে নেবার সময় হয়েছে।

দশ বছরের ছেলে আলয়োশা স্কুলের লেখাপড়া চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরের দুনিয়াকে চিনে নেবার জন্যে।

৭

অ্যালক্‌সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশ্‌কভের শৈশব-জীবন এই দশ বছর বয়সেই শেষ। এর পর তাকে আলয়োশা বলে ডাকবার আর কেউ নেই। কেউ ডাকে পেশ্‌কভ, কেউ ডাকে আলেক্‌সি। আর সেই ডাকের মধ্যেও এতটুকু স্নেহ বা ভালোবাসা থাকে না। ভারি রুক্ষ আর ভারি নির্মম মনে হতে থাকে পৃথিবীটাকে।

দশ থেকে পনেরো – আলেক্‌সির জীবনের এই পাঁচ বছর কেটেছিল নানা কাজে শিক্ষানবিশি করে।

প্রথমে এক জুতোর দোকানে ফাইফরমাস খাটার কাজ। আলেক্‌সির সেই মামাতো ভাই সাশা শেষ পর্যন্ত ডাকাত-দলের সর্দার না হয়ে এই জুতোর দোকানেই কাজ নিয়েছিল। সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ডাকাত-দলের সর্দার হতে পারলেও সে আলেক্‌সিকে প্রাণে মারবে না – সে-কথা এতদিনে বোধ হয় ভুলে গেছে। সামান্য জুতোর দোকানের সহকারী হতে পেরেই সে আলেক্‌সির জীবনকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে। তার ওপরে আছে দোকানের মালিক। এই লোকটির কথা বলার ধরণ এত খারাপ যে আলেক্‌সির কাছে অসহ্য মনে হতে থাকে। তবুও সে অপেক্ষা করেছিল যে দোকানের মালিক হয়তো নিজের থেকেই তার সামান্য একটা কিছু দোষের জন্যে তাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে

দেবে। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত নিজেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। একদিন সে সূপ গরম করছিল ; হঠাৎ পাত্রটা উলটে গিয়ে তার হাতদুটো পুড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হলো তাকে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে আর দোকানে ফিরে যায়নি।

তারপর তাকে নক্‌শা আঁকার কাজ শিখবার জন্যে আসতে হলো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে। এই আত্মীয়টির নাম ভিক্তর সার্গেয়েভ। বৌ ও মা-কে নিয়ে সে থাকে। এই দুটি স্ত্রীলোকের মধ্যে মোটেও বনিবনা নেই। রোজই তুচ্ছ সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে যায় দুজনের মধ্যে। তবে একটা বিষয়ে দুজনের মধ্যে খুবই মিল। তা হচ্ছে আলেক্‌সিকে গাধার মতো খাটিয়ে নেওয়া। একটা মিনিট সে সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। সংসারের সমস্ত কাজ তাকে দিয়ে করানো হয় এবং তারপরেও অকারণে ধমক খেতে হয় দুজনের কাছে। দুজনেই তাকে খুব ভালো-ভাবে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে সে হচ্ছে বাড়ির চাকর মাত্র আর তারা দুজনেই তাই মনিব।

ইঁদুর যেমন সুযোগ পেলেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যায় তেমনি আলেক্‌সিও একদিন এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

কয়েকদিন কাটে নিঝনি-নভ্‌গোরোদের রাস্তায় রাস্তায়। জাহাজ-ঘাটায় এসে জাহাজিদের পিছনে ঘুরঘুর করে।

শেষকালে কাজ জুটে যায় একটা। 'দোব্রি' নামে একটা স্টিমবোটে বাসন ধোয়ার কাজ। আলেক্সির মনে হয়, এতদিনে একটা মনের মতো কাজ পাওয়া গেছে।

কিন্তু তার মনের এই ভাব বেশিদিন থাকে না। 'দোব্রি' স্টিমবোটে কয়েদিদের চালান দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে যে সে নিজেও একজন কয়েদি ছাড়া কিছু নয়। ভোর থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত একটুও বিশ্রাম পায় না, রাশি রাশি থালা আর বাটি মাজতে হয় তাকে, রাশি রাশি চামচ আর ডিস পরিষ্কার করতে হয়।

তবুও একাজ তার ভালো লাগে।

ডেকে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে দেখা যায় নদীর স্থির জল, অরণ্যের নীল রেখা, দিগন্তপ্রসারিত মাঠ আর ছোটো ছোটো গ্রাম। মনে হয়, মস্ত পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে।

মনে পড়ে, অনেক বছর আগে আরেকবার স্টিমারে চেপে আস্ত্রাখান থেকে নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে গিয়েছিল! মনে পড়ে দিদিমার কথা। মনে পড়ে দাদামশাইয়ের বাড়িতে থাকার সময়ে বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পাখি ধরার কথা।

এসব কথা এত ভীষণভাবে মনে পড়ে যে শেষ পর্যন্ত একদিন আলেক্সি এই বাসন-ধোয়ার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে আসে তার দিদিমার কাছে। তারপর থেকে তার কাজই হয় একটা জাল হাতে নিয়ে বনেজঙ্গলে ঘোরা

আর পাখি ধরা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ধরে আনে আলেক্সি, আর দিদিমা সেই পাখিগুলোকে বিক্রি করে আসেন।

কিন্তু গ্রীষ্মকাল শেষ হতেই পাখির দল উড়ে চলে গেল অন্য দেশে। বাধ্য হয়ে আলেক্সিকে আবার বেরোতে হলো কাজের সন্ধানে। আবার শুরু হলো সেই দুঃসহ বন্দীজীবন।

কিন্তু ইতিমধ্যে আলেক্সি নতুন এক জগতের সন্ধান পেয়ে গেছে। সে জগৎ হচ্ছে বইয়ের জগৎ। ছেলেবেলায় অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা পড়ে একদিন সে মুগ্ধ হয়েছিল— তারপর থেকে বইয়ের পৃষ্ঠা উলটে দেখবার অবসর আর পায়নি। কিন্তু 'দোব্রি' স্টিমবোটে কাজ করার সময় হঠাৎ এক ট্রাঙ্কভর্তি বইয়ের সন্ধান পেয়ে গেল। বইগুলোর নামও যেমন অদ্ভুত, লেখাও তেমনি। কিন্তু সেই হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যেও সময় করে নিয়ে আলেক্সি সবকটা বই পড়েছিল।

তারপরেই একটা নেশা ধরে যায়। যেখান থেকে পারে বই জোগাড় করতে শুরু করে। হাতের সামনে যা পায় তাই পড়ে। এইভাবেই সে বালজাক ও ফ্লবেয়ার, পুশ্‌কিন ও গোগোল, তুর্গেনেভ ও লেরমন্‌তভ— ফরাসি ও রুশ দেশের বিখ্যাত সব লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হলো।

মনে আছে, অনেক দিন আগেকার এক উৎসবের দিনের কথা। তাকে হাজির হতে হয়েছিল গির্জার এক পাদ্রির সামনে নিজের পাপ নিজের মুখে স্বীকার করবার জন্যে।

পাদরি জিজ্ঞেস করেছিলেন, গুরুজনদের কথা তুমি মেনে

চলো ?

আলেক্সি বলল, না।

—না বলে পরের জিনিস নাও ?

—নিই।

—খেলায় বাজি রেখে পয়সার অপচয় করো ?

—করি।

ভীষণ রেগে গিয়ে পাদরি বললেন, নরকেও স্থান হবে না তোমার! তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, গোপন ইস্তাহার টিস্তাহার কখনো পড়েছ ?

— আজ্ঞে ?

—বলি, বেআইনি বই পড়েছ কখনো ?

—না পড়িনি।

—যাও, তোমার সমস্ত অপরাধ মাপ হয়ে গেল।

সেদিন থেকে বেআইনি বইয়ের ওপরে আলেক্সির ভীষণ আগ্রহ। দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলে এইসব বই পাওয়া যায়। কেউ তাকে কিছু বলতে পারে না।

একদিন একটা পত্রিকার পৃষ্ঠায় চেকভের লেখা একটা গল্প পড়ে আলেক্সির মন ভীষণভাবে নাড়া খেল। ভাবল, মানুষের মনের কথাকে টেনে বার করে এমন সুন্দর ভাবে গল্প লেখা যায়! কেন জানি বারবার মনে হতে লাগল, তারও অনেক কিছু কথা বলার আছে! চেষ্টা করলে সেও এমনি ভাবে লিখতে পারে।

একদিন আলেক্সি এক মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে শ্‌চিদ্রনের লেখা একটা নাটকের অভিনয় দেখল। দেখে মুগ্ধ হল। নাটক শেষ হবার পরেও কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় সারা রাত ঘুরে বেড়াল মাঠে মাঠে। সেই অবস্থায় সে গিয়ে পড়ে এক মাতালের হাতে। মাতালটা তাকে ধরে মারে, সে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করে না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আলেক্সি একটা থিয়েটারে কাজ পেয়েছিল। সেখানে গিয়ে টের পায়, বাইরে থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখে যা মনে হয়—আসলে তারা মোটেই তা নয়। শুধু অভিনয়ের সময়টুকু বাদ দিলে, তাদের যেমন বিশ্রী কথাবার্তা, তেমনি বিশ্রী চালচলন। আর থিয়েটারের মালিক সবার সঙ্গে চাকরের মতো ব্যবহার করে। থিয়েটারের কাজে আলেক্সি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

তারপরেই সে ঠিক করে, সে আবার পড়াশুনো করবে। আর মনের এই ইচ্ছেটুকু শুধু সম্বল করে পনেরো বছরের কিশোর ছেলেটি রওনা হয় কাজান শহরের দিকে। সেখানে নাকি মস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৮

কাজান শহরে এসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে আলেক্‌সিকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। চার-দেওয়াল-ঘেরা ডেস্‌ক-বেঞ্চি-সাজানো ক্লাশঘর সেটা নয়। তা হচ্ছে শহরতলির জীর্ণ বস্তি আর জাহাজঘাটার মালঠাসা জেটি। সেখানকার মানুষগুলোও অন্য ধরণের। গুপ্ত রাজনৈতিক দল, বাপ মা-খেদানো রাস্তার ছেলে, পুলিশ, ছাত্র ও বিপ্লবীদের নিয়ে সে এক বিচিত্র জগৎ। জাহাজঘাটায় আলেক্‌সির একটা কাজ জুটে গেল। কুড়ি কোপেক রোজ।

এই বিচিত্র জগতে এসে যাদের সঙ্গে আলেক্‌সির পরিচয় হল তারা কেউ জাহাজি, কেউ পকেটমার, কেউ ভিখিরি। এদের মধ্যে কেউ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ ছিল বড়ো চাকুরে। এখন সবাই এক। একসঙ্গে চুরি করে, একসঙ্গে মারামারি করে, একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ছোটো কাজ করলেও মানুষগুলোর মন ছোটো নয়। নিজেরা খেতে পায় না কিন্তু তবুও অন্য মানুষকে সাহায্য করে। মানুষের ওপরে তাদের অদ্ভুত দরদ।

শহরতলির ছোট্ট এক দোকানের মালিক আন্দ্রেই দেরেনকভ। তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল আলেক্‌সির। বাইরে থেকে দেরেনভের দোকানটা দেখতে অতি নিরীহ। তাকের ওপরে সাজানো আছে চিনি, মোমবাতি, মিষ্টি আর

সাবান। কিন্তু এই দোকানেরই ভিতরের দিকের একটা ঘরে লুকোনো আছে অজস্র বেআইনি বই। দেরেনকভ আসলে একজন বিপ্লবী। বিপ্লবের কাজে সাহায্য হবে বলেই সে এই দোকান করেছে।

এতদিন ধরে আলেক্সি শুধু গল্প আর উপন্যাসই পড়ে এসেছে। এই প্রথম অন্য ধরণের বইয়ের সঙ্গে পরিচয়। বৈজ্ঞানিকদের লেখা বই, চিন্তাশীলদের লেখা বই, দেশকে যারা নতুনভাবে গড়ে তুলতে চায় তাদের লেখা বই। হাতে স্বর্গ পেল আলেক্সি।

দেরেনকভের দোকানে যাতায়াত শুরু হবার পরেই গুপ্ত ছাত্রসমিতির সংস্পর্শে এসে গেল সে। এই সমিতির ছাত্ররা ইতিহাস ও অর্থনীতির বই পড়ে আর তা নিয়ে আলোচনা করে। রুশদেশে কী করে একটা বিপ্লব করা যায় —এই ছিল তাদের একমাত্র চিন্তা। আলেক্সির মনেও এদের চিন্তার ছোঁয়াচ লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চার-দেওয়াল-ঘেরা ক্লাশঘরে যে শিক্ষা সে কোনোদিনই পেত না—সেই শিক্ষাই সে পেল এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এইভাবে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করে আর নতুন নতুন বই পড়ে দিন কাটছিল আলেক্সির। তারপর শরৎকাল আসতেই জাহাজঘাটা থেকে একে একে সমস্ত স্টিমার ও জাহাজ চলে গেল। সামনে শীতকাল। এই জাহাজ-

ঘাটায় একটিও স্টিমার বা জাহাজ আসবে না। আলেক্সি আবার বেকার।

কপর্দকশূন্য অবস্থায় সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, খাবার কিনবার পয়সা নেই। কোথাও হয়তো-বা একটা নৌকোকে উলটে রাখা হয়েছে তারই তলায় শুয়ে রাত কাটায়। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে।

শেষকালে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এক রুটির কারখানায় কাজ পেল আলেক্সি। মাসে তিন রুবল মাইনে। কিন্তু আলেক্সি তাতেই রাজি। তবু তো মাথা গুঁজবার একটু জায়গা পাওয়া যাবে! বাইরে পড়ে থেকে শীতে জমে যাওয়ার চেয়ে তো ভালো!

কারখানার মালিকের নাম সেমিয়োনভ। হোদল-কুঁৎ-কুঁতের মতো চেহারা। সারাদিন কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গেলে আর উঠোনময় দাপাদাপি করে বেড়ায়। কিন্তু একদিকে তার টনটনে হুঁশ! কারখানার শ্রমিকদের পশুর মতো খাটিয়ে নিতে পারে সে।

কিন্তু আলেক্সি অবাক হয়ে দেখল যে শরীরের রক্ত জল করে পশুর মতো খাটার পরেও শ্রমিকরা মালিকের গুণকীর্তন করে। তাদের যে অন্যায়ভাবে শোষণ করা হচ্ছে সেই জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তাদের নেই।

সতেরো বছর বয়সের মধ্যেই আলেক্সি অনেক কিছু

দেখেছে, অনেক বই পড়েছে। সে চুপ করে রইল না। শ্রমিকদের বোঝাতে শুরু করল, দিনে চোদ্দ ঘণ্টা খেটেও কেন তারা খেতে পরতে পায় না, আর কী করলে পরে এই অবস্থার প্রতিকার হতে পারে। আর নিজের কাজের জায়গায় এমনভাবে সে একটা কাঠামো তৈরি করে নিল যে কাজ করতে করতেও বই পড়া চলে। মাঝে মাঝে শ্রমিকদের বই পড়ে শোনাতে লাগল।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই চলেছিল মালিকের চোখের আড়ালে। মালিক ঘরে ঢুকছে টের পেলেই বই লুকিয়ে ফেলা হয় আর সবাই চুপ করে যায়।

কিন্তু খুব বেশিদিন কাটল না। একদিন মালিকের কাছে বইসমেত ধরা পড়ে গেল আলেক্‌সি। ফলে ভীষণ রকমের শাস্তি পেতে হলো তাকে।

কিন্তু সেমিয়োনভ তখনো বুঝতে পারেনি যে আলেক্‌সি সাধারণ শ্রমিকের মতো নয়। আলেক্‌সি মানুষের মতো মাথা উঁচু করে চলতে জানে।

একদিন আলেক্‌সি কাজ করতে করতে কাঠামোর ওপরে রাখা তলস্তয়ের একটা বই পড়ছে—এমন সময় ঘরে ঢোকে সেমিয়োনভ। আলেক্‌সিকে এভাবে বই পড়তে দেখে তার এমন রাগ হয় যে বইটাকে চুল্লির আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সেমিয়োনভের একটা হাত চেপে ধরে

আলেক্সি ধমক দিয়ে ওঠে : খবরদার বলছি !

সতেরো বছরের ছেলের সেই ধমক শুনে সেমিয়োনভকে ফিরিয়ে দিতে হয় বইটা।

ওদিকে দেরেনকভ একটা রুটির কারখানা খুলেছে। কারখানার আয় থেকে বিপ্লবের কাজে সাহায্য করা হবে। এই রুটির কারখানাটাকে ঠিকমতো চালাবার জন্যে ডাক পড়ল আলেক্সির।

দেরেনকভের কারখানায় এসে আলেক্সির কাজ আরো বেড়ে গেল। কারখানার ভিতরে ময়দা মাখা, লেচি তৈরি করা, এসব কাজ তো আছেই—কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কাজ হচ্ছে ছাত্রদের কামরায় ঝুড়ি ভর্তি করে রুটি পৌঁছে দেওয়া। আর রুটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিসও সে ছাত্রদের হাতে গুঁজে দেয়। তা হচ্ছে আগুনের ভাষায় লেখা বিপ্লবের ইস্তাহার।

কিছুদিনের মধ্যেই আলেক্সির ওপরে পুলিশের নজর পড়ে। নিকিফোরিচ নামে একজন পুলিশের লোক ছায়ার মতো ঘোরে তার পিছনে পিছনে, গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করে আর প্রায়ই তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে হাজার রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করে।

এই নিকিফোরিচ কথায়কথায় একদিন বলেছিল : গোটা দেশটার ওপরে একটা জাল ছড়িয়ে আছে। মহামান্য জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার আছেন এই জালের মধ্যিখানে। আর

এই জালের এক-একটা গিঁট হচ্ছে সম্রাটের এক-একজন মন্ত্রী, রাজ্যের এক-একজন শাসনকর্তা, এক-একজন সরকারি কর্মচারী, এমনকী অতি নগণ্য একজন পাহারাওলা পর্যন্ত।

কথাটা আলেক্সিকে খুব ভালোভাবেই বুঝতে হয়েছিল। গোটা দেশের ওপরে পুলিশ আর গোয়েন্দার জাল ছড়ানো আছে। যেখানে যে কেউ অন্য ধরণের কথা ভাবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই জাল দিয়ে টেনে তোলা হয়।

আলেক্সি বুঝতে পারল, সেও আস্তে আস্তে এই জালের মধ্যে আটকা পড়ে যাচ্ছে।

সারা দিন কারখানার কাজে নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। কাজের শেষে যখন ঘরে ফিরে আসে তখন এত ক্লান্ত থাকে যে হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা থাকে না। তবুও তারপরে সে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসে। একটা উলটিয়ে-বসানো প্যাকিং বাক্স হয় তার টেবিল। আর সেই টেবিলে পাশাপাশি সাজানো থাকে তলস্তয় ও পুশ্‌কিনের রচনা, সেচেনভের শারীরবিদ্যার বই আর জার্মান কবি হাইনের কবিতার বই।

পুলিশের খাতায় লাল-কালিতে আলেক্সির নাম ওঠে। কারখানার সামান্য একজন মজুর বই পড়ে—এটাই পুলিশের চোখে একটা অপরাধ। তার ওপরে যে লোক রাত্রিবেলা রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি না করে ঘরে বসে আলো জ্বালিয়ে বই পড়ে—সে তো নিশ্চয়ই অতি সাংঘাতিক লোক!

সেই অদৃশ্য জাল আলেক্সির চারদিকে ঘনিয়ে আসে।

৯

এর পরের কয়েকটা বছর কাটে ভয়ানক একটা অস্থিরতার মধ্যে।

বছর উনিশ যখন বয়েস, তখন একদিন হাইনের কবিতা পড়ে তার ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সে বাজারে গিয়ে তিন রুবল দিয়ে একটা রিভলবার কেনে আর অনেক রাত্রে কাজান্‌কা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজের বুক লক্ষ করে গুলি করে বসে।

তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো তখন তার জ্ঞান নেই। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ডাক্তার রায় দিলেন : বাঁচবার আশা নেই। তিনটে দিন কাটবে কিনা সন্দেহ।

ডাক্তারের কথাগুলো কানে যেতেই আলেক্‌সির যেন জ্ঞান ফিরে এল। স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, না, আমি মরব না।

রোগীর এই বেয়াদপি দেখে রেগে গিয়ে ডাক্তার বললেন, তুমি চুলোয় যাও!

আর সত্যি সত্যিই আলেক্‌সি বেঁচে উঠল। তারপর চুলোয় না গিয়ে একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল পায়ে হেঁটে। মাঝে মাঝে কোথাও বা একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে দু-একদিনের জন্যে ডেরা বাঁধে। আবার বেরিয়ে

পড়ে। একবার রোমাস নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে কিছুদিন সে এক গ্রামে কাটিয়েছিল। সেখানে একদিন রাত্রিবেলা জোতদাররা তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। চিলকোঠার ঘর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচায় আলেক্সি।

কিছুদিন সে এক রেলস্টেশনে রাত-পাহারাদের কাজ করে। কিছুদিন কাস্পিয়ান সাগরের ধারে জেলেদের সঙ্গে জীবন কাটায়। চারদিকে মানুষের হানাহানি কাড়াকাড়ি দেখে মন খারাপ হয়ে যায় তার। একটা ভাঙা কলসির জন্যে লাঠালাঠি করে বাপ আর ছেলে। গির্জার পাদ্রি নানা ছুতোয় পয়সা আদায় করে মানুষের কাছ থেকে। কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে ধরে মারে স্বামী। এমনকী যারা অনেক লেখাপড়া শিখে বিপ্লবের পথে এসেছে তারাও যেন আলেক্সিকে কিছুতেই নিজেদের লোক মনে করতে পারে না।

আর এই রূঢ় ও নির্মম পৃথিবীতে আলেক্সির একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে ওঠে—বই। হাইনে আর শেক্সপীয়র। রাতের পর রাত এই দুই দিকপাল লেখকের রচনার মধ্যে ডুবে থাকে সে।

সে-সময়ে রুশদেশে প্রত্যেককে বাইশ বছর বয়সে সৈন্যদলে যেতে হতো। আলেক্সিও যায়। কিন্তু তাকে সৈন্যদলে নেওয়া হয় না। রিভলবারের গুলিতে তার ফুসফুস

ফুটো হয়ে গেছে। সৈন্যদলের কাজের সে অনুপযুক্ত।

তখন আবার সে দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরে এল নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে। রাস্তার লোক তাকিয়ে থাকে তার অদ্ভুত সাজপোশাকের দিকে। মাথায় চওড়া কিনারওলা টুপি, পরনে পাচকদের মতো শাদা টিউনিক আর পুলিশের দারোগার মতো নীল ট্রাউজার।

আর শুধু রাস্তার লোক নয়, পুলিশেরও নজর পড়েছে। নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে এসে সে বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে, গুপ্তসভায় যায়। এই অবস্থায় আর বেশিদিন আলেক্‌সিকে বাইরে ছেড়ে রাখা পুলিশের কাছে নিরাপদ মনে হয় না। আলেক্‌সিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের বড়োকর্তা আলেক্‌সিকে জেরা করতে গিয়ে অযাচিত উপদেশ দেয় : দেখো বাপু, কবিতা-টবিতা লিখতে চাও তো এসব রাজনীতির দিকে এসো না।

পুলিশের বড়োকর্তাটি সে-সময়ে কল্পনাও করতে পারেনি যে, আর কয়েক বছর পরেই এই কাঠখোট্টা চেহারার ছেলেটির লেখা সারা দেশে বিপ্লবের উত্তাল ঢেউ তুলবে।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আলেক্‌সি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। সে-সময়ের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হচ্ছেন কোরোলেঙ্কো। নিজের লেখা একটা কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করল আলেক্‌সি।

কোরোলেঙ্কো মন দিয়ে তার পাণ্ডুলিপি পড়লেন।

কয়েকটা অশুদ্ধ শব্দের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আর ভাষারও যে নিজস্ব একটার ছন্দ আছে, যা আলেক্‌সির লেখায় তা তখনো আসেনি — সে-কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। দিন সাতেক পরে তিনি পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দিয়ে মন্তব্য লিখে দিলেন : নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে চেষ্টা করো।

অভিজ্ঞতা আলেক্‌সির কম নয়। কিন্তু তবুও তার মনে হতে লাগল, আরো অভিজ্ঞতা চাই। সত্যিকারের জীবনকে এবং সত্যিকারের আবেগকে জানতে হবে।

এই চিন্তাটা অস্থির করে তুলল তাকে। নিঝ্‌নি-নভ্‌-গোরোদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। তারপর একদিন ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

কিছুদিন কাটল ভল্‌গা নদীর ধারে ধারে। তারপর জারিৎসিনে এসে ভল্‌গা নদীর পাড় ছেড়ে ঢুকে পড়ল গ্রামাঞ্চলের মধ্যে। বিশাল বিপুল রুশদেশ। দিগন্তপ্রসারিত স্তেপঅঞ্চল। বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্র জীবিকা। আর তারই মধ্যে দিয়ে জীবনকে ছুঁয়েছুঁয়ে চলেছে শাদা টিউনিক আর নীল ট্রাউজার পরা একটি ছেলে।

রোস্তভ-এ এসে কিছুদিনের জন্যে ডেরা বাঁধে। সেখান থেকে গোটা ইউক্রেন হেঁটে পাড়ি দিয়ে চলে আসে একেবারে বেসারাবিয়া পর্যন্ত। বেসারাবিয়া হচ্ছে রুশদেশের শেষ শহর ; এর পর দানিয়ুব নদী পার হলেই রুমানিয়ার শুরু।

দানিয়ুব থেকে ফিরে যায় ক্রিমিয়া ও ট্রান্‌স্‌ককেশিয়ার দিকে! কৃষ্ণসাগরের ধার দিয়ে দিয়ে অগ্রসর হয়ে পার হয় মল্‌দাভিয়া, ক্রিমিয়া, কুবান, জর্জিয়া—গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর। কার্চ প্রণালীতে ডুবতে ডুবতে বেঁচে যায়, জর্জিয়ার রাস্তায় বরফে চাপা পড়তে পড়তে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে। আর যেখানেই যায়, খিদের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। পাগলা কুকুরের মতো খিদে তাকে তাড়া করে ফেরে।

এইভাবে হাজার হাজার মাইল হেঁটে পার হয়। পুরো হুটি বছর ঘুরে বেড়ায় ভবঘুরের মতো।

মাঝে মাঝে আলেক্‌সি ভাবে, কিসের তাড়নায় সে এমন অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কী চায় সে?

নদীর জল তিরতির করে সমুদ্রের দিকে চলে যায়। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সরসর শব্দ তুলে ইঁদুর ছুটোছুটি করে। পাহাড়ি ঝর্নার জল ফেনা তুলে পাক খায় আর গাছের শুকনো পাতা খসে খসে পড়ে। কাঠঠোকরা শব্দ করে চলে—ঠক্‌, ঠক্‌, ঠক্‌,...

এসব দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে মানুষকে দেখতে। সব রকমের মানুষ। সব ধরণের মানুষ। সব সময়ের মানুষ। রুশদেশের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে হবে তাকে।

আর এজন্যে তাকে কম মূল্য দিতে হয় না।

ইউক্রেনের এক গ্রামে এসে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে।

একটি দুই ঘোড়ার গাড়িতে একটি ঘোড়া আছে আর দ্বিতীয় ঘোড়াটার জায়গায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে একজন স্ত্রীলোককে। কোচোয়ানের আসনে বসে আছে এই স্ত্রীলোকটির স্বামী। শপ শপ করে চাবুক চালাচ্ছে সে। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটেছে আর একই জোয়ালে বাঁধা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হচ্ছে স্ত্রীলোকটিকে। গাড়ির পিছনে হাততালি দিতে দিতে চলেছে গ্রামসুদ্ধ লোক।

স্ত্রী যদি গুরুতর কোনো পাপ করে তাহলে তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।

চোখের ওপরে এই দৃশ্য দেখে আলেক্সি রুখে দাঁড়ায়। হতভাগ্য স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে সে। তখন গ্রামের সমস্ত লোকের রাগ গিয়ে পড়ে তার ওপরে। সকলে মিলে বেদম প্রহার দেয় তাকে। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় টানতে টানতে নিয়ে গ্রামের বাইরে জলকাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে আসে।

বাঁচবার আশা ছিল না আলেক্সির। কিন্তু তার কপাল বলতে হবে, গাড়ি করে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক তাকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে তুলে নেন এবং হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আরেকবার কুবানের গ্রামাঞ্চল দিয়ে যেতে যেতে আলেক্সি হঠাৎ শোনে যে মাইকপ শহরে সৈন্যরা চাষীদের ওপর গুলি চালিয়েছে। বহু লোক মারা গেছে, শহর ছেড়ে

পালিয়ে গেছে অনেকে।

সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সি গিয়ে হাজির হয় সেখানে। গিয়ে দেখে, শহরে দারুণ আতঙ্ক, রাস্তাঘাট জনশূন্য, ঘরে ঘরে বিধবারা চোখের জল ফেলছে।

শহরে পা দেবার কয়েকদিনের মধ্যেই আলেক্সির ওপর সৈন্যদের নজর পড়ে যায়। তাকে তারা গ্রেপ্তার করে।

সৈন্যদলের বড়োকর্তা হাজার রকম প্রশ্ন করে আলেক্সিকে। যে শহর থেকে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে—সেখানে এ লোকটা আসে কেন? কিন্তু সমস্ত প্রশ্নের জবাবে আলেক্সি শুধু বলে, রাশিয়াকে জানতে চাই আমি।

রাশিয়াকে জানতে চাওয়ার অপরাধে দ্বিতীয়বার কারাগারে যেতে হয় আলেক্সিকে।

মাইকোপের কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার শুরু হয় পথ চলা। চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সে এসে হাজির হয় ককেসাসের তিফ্‌লিস শহরে। এক রেল-কারখানায় কাজ জুটে যায়। আবার শুরু হয় গুপ্ত সভায় যাতায়াত, নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা আর মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী প্রচার।

এখানে এসে আলেক্জান্দার মেফোদিয়েভিচ কালুঝ্‌নি নামে একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ হয় আলেক্সির।

আলেক্সির মুখে তার জীবনের নানা ঘটনা শুনে কালুঝ্‌নি তাকে গল্প লিখতে উৎসাহিত করেন।

আলেক্সি লিখতে শুরু করে। তার দেখা রাশিয়া এক বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে।

তারপর একদিন তিফ্লিসের এক সংবাদপত্রের সম্পাদকের হাতে একটি গল্পের পাণ্ডুলিপি আসে। গল্পটির নাম, 'মাকার চুদ্রা'। গল্পটি পড়ে সম্পাদকের ভালো লাগে। কিন্তু অনেক খুঁজেও পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

সম্পাদক ডেকে পাঠান লেখককে। সম্পাদকের সামনে বসেই লেখক পাণ্ডুলিপির তলায় নিজের নাম লেখেন: ম্যাক্সিম গর্কি।

শৈশবের আলয়োশা নয়। কৈশোরের আলেক্সি নয়। আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশ্কভও নয়। ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কি শব্দের অর্থ—তেতো। এই অদ্ভুত নামকে আশ্রয় করে আমাদের আলেক্সির জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

১০

প্রথম গল্প ছাপার অক্ষরে বেরোবার পরেও কয়েকটা বছর কাটল নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করে নিতে। তিফ্‌লিস থেকে গর্কি আবার চলে এলেন নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে। সেখানে এক উকিলের মুহুরি হয়ে কাটালেন কিছুদিন।

তারপর নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদ থেকে চলে এলেন সামারায়। 'সামারাস্কায়া গাজেতা' পত্রিকায় তিনি চাকরি পেয়েছিলেন।

সামারায় এসে তিনি লোকজনের সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করতেন না। থাকতেন ভল্‌গা নদীর ধারে ছোট্ট একটা ঘরে। নিজেকে তিনি মস্ত একটা কাজের জন্যে তৈরি করে নিচ্ছিলেন। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এতদিনে তিনি সত্যিকারের পথের সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন তিনি।

শেকসপীয়র ও গ্যেটে, ডিকেন্স ও মোপাসাঁ, থ্যাকারে ও হুগো, লেরমন্‌তভ ও বারাতিন্‌স্কি, ফ্লবেয়ার ও স্তঁদাল — দেশের ও বিদেশের প্রত্যেকের লেখা পড়তে লাগলেন। শুধু পড়া নয়, ছাত্রের মতো অনুশীলন করলেন।

ভল্‌গা নদীর ধারে তাঁর সেই ছোটো ঘরে সারা রাত মোমবাতির আলো জ্বলত। এক-একদিন রোদ উঠে যাবার পরেও সেই আলো নিবত না।

সামারা থেকে আবার তিনি নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে ফিরে

এলেন। এখানেও এক পত্রিকা আপিসের চাকরি। এই নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে থাকার সময়েই তিনি অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এক প্রকাশক জোগাড় করলেন এবং নিজের সমস্ত লেখা প্রকাশ করলেন দুটি পৃথক খণ্ডে।

মফস্বল শহরের একজন প্রকাশক মস্ত একটা ঝুঁকি নিয়ে গর্কির গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করার পরেই একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন ম্যাক্সিম গর্কি। তাঁর বই হাজারে হাজারে বিক্রি হতে লাগল। রুশদেশের সাহিত্যের আকাশ তখন দুই সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। একজন লিও তলস্তয়, অপরজন আন্তন চেকভ। এতদিনে তৃতীয় সূর্যের আবির্ভাব হলো। এই তৃতীয় সূর্য ম্যাক্সিম গর্কি।

১১

কিন্তু ম্যাক্সিম গর্কির জীবন তলস্তয় বা চেকভের মতো নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ নয়। লেখক হিসাবে তাঁর খ্যাতি যত বাড়ে, জার-সরকারের আতঙ্কও তত বাড়ে। জারের পুলিশ বারবার তাঁকে জেলে পুরেছে। বারবার দেশ থেকে পালিয়ে বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। খুব বেশিদিন তাঁকে কারাগারের বাইরে রাখা জারের পুলিশ কোনো সময়েই নিরাপদ মনে করেনি।

একবার আফানাসিয়েভ নামে একজন বিপ্লবী শ্রমিককে পুলিশ তিফ্লিস শহরে গ্রেপ্তার করে। তার ঘর খানাতল্লাসি করে পাওয়া যায় ম্যাক্সিম গর্কির একটি ফটো ; নিচে গর্কির নিজের স্বাক্ষর। পুলিশ এই সুযোগ ছাড়ে না। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আটক রাখা হয় মেতেখ দুর্গে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগকে পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি। গর্কিকে ছেড়ে দিতে হয়। খালাস পেয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন নিঝ্নি-নভ্গোরোদে।

নিঝ্নি-নভ্গোরোদে এসে গর্কি টের পান যে পুলিশ তাঁর ওপরে সব সময়ে নজর রাখছে। যেখানেই তিনি যান, একপাল গোয়েন্দা তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করে। তাঁর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তাদের পিছনেও গোয়েন্দা লাগে।

গর্কির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

তবু পুলিশের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও প্রচুর লোক দেখা করতে আসে গর্কির সঙ্গে। কেউ আসে বই নিতে, কেউ আসে সাহিত্য আলোচনা করতে, কেউ আসে শ্রদ্ধা জানাতে। সবার সঙ্গে দেখা করেন গর্কি। সবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

এমনকী আসে ছোটো ছেলেমেয়েরাও। ছেঁড়া জামাকাপড়, খালি পা, উশকোখুশকো চুল। কারও মাথা গুঁজবার ঠাঁই আছে, কারও নেই। কিন্তু এত গরিব ওরা যে দুবেলা দু-মুঠো খাবারও জোটে না। কোনোরকম আমোদ-আহ্লাদ ওদের জীবনে নেই। ওদের দুঃখ গর্কির চেয়ে বেশি আর কে বুঝবে? তাই মাঝে মাঝে গর্কি এইসব গরিব ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে জড়ো করে উৎসবের ব্যবস্থা করেন। ওদের জামা-কাপড়-জুতো কিনে দেন, পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ান।

গৃহহীন ভবঘুরে মানুষদেরও তিনি ভুলে যাননি। ওরা রাস্তায় জন্মেছে, রাস্তাতেই বড়ো হয়ে উঠেছে, হয়তো রাস্তাতেই একদিন মরে পড়ে থাকবে। গর্কি নিজেও দশ বছর বয়স থেকে ঘরছাড়া। তারপর থেকে তাঁর জীবন কেটেছে এইসব মানুষের সঙ্গেই। ওদের কথা তিনি ভুলবেন কী করে? ওদের জন্যে তিনি তৈরি করে দিলেন আশ্রয়, ব্যবস্থা করলেন আমোদ-প্রমোদের। যারা কোনোদিন নিজেদের মানুষ বলে মনে করেনি তাদের দিলেন মানুষের মর্যাদা।

আর শুধু এইটুকুই নয়। প্রায়ই তিনি গিয়ে হাজির হন নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদের শ্রমিক-এলাকা সরমভোয়। এখানে গোপন সভা বসে। পড়া হয় বেআইনি বই ও খবরের কাগজ। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে 'ইস্‌ক্রা' পত্রিকা নিয়ে আসা হয়। লেনিন যে বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছিলেন, এই পত্রিকাটি হচ্ছে সেই দলের পত্রিকা। লেনিনের নিজের লেখা থাকে এই পত্রিকায়। গোপন সভায় 'ইস্‌ক্রা' পত্রিকা পড়া হয় আর শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বিপ্লবের বাণী।

সরমভোর শ্রমিকেরাও প্রায়ই যাতায়াত করে গর্কির কাছে।

১৯০১ সালে গর্কি গিয়েছিলেন সেণ্ট পিতার্সবুর্গে। সেখানে চোখের ওপরে দেখলেন ছাত্রদের এক মিছিল ভাঙবার জন্যে পুলিশের নৃশংস তাণ্ডবলীলা। তারপরেই তিনি লিখলেন— 'ঝোড়ো পাখির গান'।

'ঝড়! এই মুহূর্তে ঝড় ফেটে পড়বে!'

সারা দেশের মানুষ একসঙ্গে এই গান গেয়ে ওঠে। এই গান গাইতে গাইতে জেগে ওঠে সারা দেশের মানুষ।

সেণ্ট পিতার্সবুর্গ থেকে ফিরবার পথে গর্কি এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন। একটি মিমিওগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে এলেন নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদে। মিমিওগ্রাফ যন্ত্র দিয়ে একটি লেখার ছাপ যত খুশি কাগজে তুলে নেওয়া যায়। সুতরাং এধরণের যন্ত্র বিপ্লবীদের খুবই কাজে লাগে। আর পুলিশ

কড়া নজর রাখে, বিপ্লবীরা যাতে কিছুতেই এই যন্ত্র জোগাড় করতে না পারে।

এবারেও পুলিশ টের পেয়ে গেল। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো গর্কিকে। নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদের কারাগারে আটক রইলেন তিনি।

এবারে প্রতিবাদ ফেটে পড়ল কারাগারের বাইরে। স্বয়ং তলস্তয় সুর মেলালেন সেই প্রতিবাদে। জার সরকার বাধ্য হল গর্কিকে কারাগার থেকে ছেড়ে দিতে। তারপর গর্কি নিজের বাড়িতেই নজরবন্দী হয়ে রইলেন। বাড়ির সর্বত্র, এমনকী রান্নাঘরে এবং শোবারঘরের বারান্দায় পর্যন্ত বন্দুক-হাতে সান্ত্রি দাঁড় করানো হলো।

কিন্তু সান্ত্রি দাঁড় করিয়ে ঘরের বাইরে যাতায়াত হয়তো বন্ধ করা যায়, ঘরে বসে লেখাকে বন্ধ করা যাবে কী করে? অনেক রাত পর্যন্ত গর্কির ঘরে আলো জ্বলে। নিজেকে তিনি পুরোপুরি লেখার কাজে ছেড়ে দেন।

ব্যাপার দেখে পুলিশের আক্রোশ আরো বেড়ে গেল। তারা সবচেয়ে বেশি ভয় করে গর্কির লেখাকে। আর পুলিশের নাকের ওপরে বসে সেই লেখাই তিনি লিখে চলেছেন!

তাছাড়া পুলিশ বহু চেষ্টা করেও সরমভোর বিপ্লবী শ্রমিকদের সঙ্গে গর্কির যোগাযোগকে কিছুতেই বন্ধ করতে পারেনি। পুলিশের সমস্ত সতর্ক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে কী করে যে তারা গর্কির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে তা পুলিশ

কিছুতেই ধরতে পারে না।

তখন মরিয়া হয়ে পুলিশ গর্কির নির্বাসনের ব্যবস্থা করল। হুকুম হলো যে গর্কিকে নিঝ্‌নি-নভ্‌গোরোদ ছেড়ে আর্জামাস নামে অখ্যাত গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে হবে।

ইতিমধ্যে গর্কির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, ডাক্তাররা বললেন যে দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে না পারলে তাঁর শরীর কিছুতেই সারবে না। ওদিকে গর্কির নির্বাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আবার প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। স্বয়ং তলস্তয় সুর মিলিয়েছেন সেই প্রতিবাদে। জারের পুলিশকে ধিক্‌কার জানিয়ে শোনা গেছে লেনিনের বজ্রকণ্ঠ।

এবারেও জারের পুলিশ হুকুম বদলাতে বাধ্য হলো। কয়েক সপ্তাহ ক্রিমিয়ায় কাটিয়ে আসার অনুমতি পেলেন গর্কি।

ক্রিমিয়ায় রওনা হবার দিন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সারা শহরের মানুষ এসেছে গর্কিকে বিদায় জানাতে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুঁসে উঠছে, আছড়ে পড়ছে সেই জনতা, বিপ্লবের গান গাইছে আর ধ্বনি তুলছে: 'ম্যাক্সিম গর্কি জিন্দাবাদ! অত্যাচারের অবসান চাই!'

'ঝোড়ো পাখির গান'-এর লেখক নিজের চোখেই যেন প্রত্যক্ষ করলেন নিজেরই লেখার লাইন:

ঝড়! এই মুহূর্তে ঝড় ফেটে পড়বে!

১২

মস্কো আর্ট থিয়েটারে চেকভের একটি নাটকের অভিনয় দেখে গর্কি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মানুষের সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যে এইভাবে মূর্ত করে তোলা যায়, তা গর্কি নিজেও ভাবতে পারেননি। তখন থেকেই তাঁর মনে ইচ্ছে ছিল, তিনি নিজেও একটি নাটক লিখবেন।

তারপর ক্রিমিয়ায় থাকার সময়ে একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। সে-সময়ে চেকভ এসেছিলেন ক্রিমিয়ায়। আর চেকভের নাটক অভিনয় করবার জন্যে এসেছিল মস্কো আর্ট থিয়েটারের পুরো দলটি।

চেকভের সঙ্গে গর্কির দীর্ঘ আলোচনা হল। চেকভ নিজেও গর্কিকে নাটক লিখবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন।

ক্রিমিয়ায় থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পরে গর্কি চলে এলেন আর্জামাসে। এবং এখানে থাকার সময়েই তিনি নাটক লেখায় হাত দিলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিজের পছন্দমতো লেখা আর হয়ে ওঠে না। যতই লেখেন ততই মনে হয় আরো ভালো লেখা হওয়া উচিত। এই সময়ে চেকভের কাছে তিনি কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন। এইসব চিঠি থেকে বোঝা যায় নাটক লেখবার জন্যে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রমই না তাঁকে করতে

হয়েছিল।

তাঁর লেখা প্রথম নাটকের নাম 'ফিলিস্টিন'। ফিলিস্টিন কথাটা সাধারণত ব্যবহৃত হয় তাদের সম্পর্কে যাদের শিক্ষা-দীক্ষা নেই, যারা ভব্যতা-সভ্যতার ধার ধারে না। এই নাটকে তিনি লিখেছেন বেসেমেনভ পরিবারের কথা। নাটকটি পড়ে বোঝা যায়, নাটকটি লেখার সময় তাঁর দাদা-মশাই কাশিরিন পরিবারের কথাই বিশেষ করে তাঁর মনে ছিল। তখনকার দিনে রুশদেশের অবস্থাটাই ছিল মস্ত একটা কাশিরিন পরিবারের মতো। তেমনি মারামারি, কাটাকাটি, তেমনি স্বার্থপরতা ও অর্থলোলুপতা। সেখানে কেউ কারও ভালো দেখতে পারে না, টাকার লোভে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। মনে হয় মানুষগুলো যেন এক অন্ধকার গুহার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সেখানে বাইরের আলো-হাওয়া ঢুকতে পারে না, ভিতরের বাতাসও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। নিজের ছেলেবেলার সেই রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ার কথাই গর্কি ফুটিয়ে তুললেন এই নাটকে।

গর্কির দ্বিতীয় নাটকের নাম 'নিচুতলার আঁধারে'।

এই নাটকে তিনি যাদের কথা লিখেছেন তারা সবাই তাঁর কাছে খুবই পরিচিত। দশ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে এদের সঙ্গেই দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তিনি। এরা হচ্ছে সেইসব মানুষ, মানুষের সমাজ যাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। জাহাজঘাটার বেকার, রাস্তার ভিখিরি, জেল-

ফেরত আসামী—এমনি সব লোক। এরাও যে একসময়ে মানুষ ছিল, মানুষের মতোই এরা বাঁচতে চায়—এই কথাই গর্কি ঘোষণা করলেন তাঁর নাটকে।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে গর্কির নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলতে লাগল। আর গর্কির নাটক অভিনীত হবে শুনে সবচেয়ে আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল জারের পুলিশ। অভিনয় বন্ধ করবার সাহসও তাদের ছিল না। অভিনয় বন্ধ করলে হয়তো সারা দেশের লোক খেপে উঠত।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে গর্কির নাটকের অভিনয়ের দিন দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সারা প্রেক্ষাগৃহকে উর্দিধারী পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। এমনকী থিয়েটারের কর্মচারীদের পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের স্থান নিয়েছে পুলিশ। সে দৃশ্য দেখে যে কেউ মনে করতে পারত যে ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ড হতে চলেছে। আজ জারের পুলিশ সত্যি সত্যিই মনে করেছিল, গর্কির নাটক শহরের লোককে একেবারে খেপিয়ে তুলবে। মস্কো আর্ট থিয়েটার থেকেই হয়তো শুরু হয়ে যাবে একটা বিপ্লব।

বিপ্লব না হোক, মস্কো আর্ট থিয়েটারে সেদিন যে দৃশ্য দেখা গেল তা অভূতপূর্ব। প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত মানুষ বিপুল-ভাবে অভিনন্দন জানাল গর্কির নাটককে। শুধু একটা নাটকের অভিনয় যে এতগুলি মানুষকে এমনভাবে উদ্বেলিত করে তুলতে পারে তা এর আগে জানা যায়নি।

নাটকের অভিনয় চলাকালে শ্রোতাদের অনুরোধে নাট্য-কারকে বারবার মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হলো। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই উদ্বেলিত জনতার দিকে তাকিয়ে গর্কি আরেকবার প্রত্যক্ষ করলেন :

ঝড়! এই মুহূর্তে ঝড় ফেটে পড়বে!

১৩

তারপর ঝড় ফেটে পড়তে খুব বেশি দেরি হয়নি। ১৯০৫ সালের ৯ জানুয়ারি সেণ্ট পিতার্সবুর্গে কয়েক লক্ষ শ্রমিকের একটা মিছিল বেরিয়েছিল। তারা 'ইন্‌কিলাব-জিন্দাবাদ' আওয়াজ তোলেনি, একটা দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিল জারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। জার তাদের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার করবেন, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। সেই কয়েক লক্ষ নিরস্ত্র শ্রমিকের মিছিলের ওপর জারের সৈন্যরা গুলি চালায়। সেণ্ট পিতার্সবুর্গের রাস্তায় রক্তের বন্যা বইতে শুরু করে। প্রাণ হারায় হাজার হাজার মানুষ।

চার বছর আগে গর্কি একবার নিজের চোখে দেখেছিলেন ছাত্রদের মিছিলের ওপর পুলিশের তাণ্ডবলীলা। এবার নিজের চোখে দেখলেন, হাজার হাজার মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করার দৃশ্য।

আর গর্কি নিজের কানে শুনলেন রাস্তার মানুষ রক্তমাখা শরীরে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে : 'আজ থেকে আমাদের আর জার নেই! জার খুন হয়ে গেছে!'

শ্রমিকরা যখন মিছিল করে এসে জারের প্রাসাদের সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল তখনো পর্যন্ত সবার মনে বিশ্বাস ছিল, জার হচ্ছেন তাদের বাপের মতো, বাপ কখনো সন্তানদের শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন?

শুধু হাতে তাদের ফিরতে হয়নি। ফিরতে হয়েছিল হাজার হাজার সাথির রক্তাক্ত মৃতদেহকে সঙ্গে নিয়ে। আর জারের যে মূর্তিটি তারা মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিল তা ভেসে গেল এই রক্তের বন্যায়। জারের পুলিশ আসলে সাধারণ মানুষকে খুন করেনি, খুন করেছে তাদেরই জারকে।

তারপরেই তৈরি হলো সেণ্ট পিতার্সবুর্গের রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। শুরু হলো প্রতিরোধ।

দেশের এবং বিদেশের মানুষের উদ্দেশে গর্কি এক আবেদন প্রচার করলেন। আগুনের ভাষায় লেখা সেই আবেদন। দেশের মানুষকে তিনি সরাসরি ডাক দিলেন বিপ্লবের পথে। জারের শাসনকে দেশের মানুষ যেন আর কিছুতেই সহ্য না করে! খুনি জারকে তারা যেন কিছুতেই ক্ষমা না করে!

১১ই জানুয়ারি জারের পুলিশ গর্কিকে আবার গ্রেপ্তার করল। এবার তাঁকে আটক রাখা হলো নরকের মতো ভয়ংকর এক দুর্গে। গর্কি যে আবার কোনোদিন জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারবেন, সে আশা রইল না।

কিন্তু এই নরকের মতো ভয়ংকর কারাগারে বসেও গর্কি নতুন একটি নাটক লিখতে শুরু করলেন। কারাগারে আটক করেও জারের পুলিশ গর্কির কলমকে স্তব্ধ করতে পারল না।

আর এবারেও শুরু হলো প্রবল প্রতিবাদ। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল

ক্রাঁস গর্কির মুক্তির দাবি জানিয়ে ঘোষণা করলেন : গর্কি শুধু রাশিয়ার নন, তিনি সারা পৃথিবীর! প্রতিবাদ জাগল জার্মানিতে, পর্তুগালে, ইতালিতে, বেলজিয়ামে। প্রতিবাদ জানালেন সব দেশের সবচেয়ে বড়ো বড়ো শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকরা। গর্কির লেখা যে দেশে-বিদেশে কত বড়ো একটা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

আর এই প্রবল প্রতিবাদের সামনে জার সরকার বাধ্য হলো মাথা নোয়াতে। গর্কি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন।

সারা দেশ জুড়ে তখন চলেছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। বিপ্লবীরা অস্ত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে। কারাগার থেকে বেরিয়ে গর্কি নিজেও এই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯০৫ সালের বিপ্লব শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব সফল হয়নি। জারের পুলিশ নির্মমভাবে এই বিপ্লবকে দমন করেছিল।

তখন অবস্থা এমন দাঁড়াল যে গর্কির পক্ষে রুশদেশে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়। যে কোনো মুহূর্তে জারের পুলিশ তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করতে পারে। তখন বন্ধুদের পরামর্শে গর্কি পালিয়ে গেলেন দেশ থেকে। প্রথমে গেলেন জার্মানিতে। সেখান থেকে ফ্রান্সে, শেষকালে আমেরিকায়।

বিদেশে গিয়েও তিনি এক মুহূর্ত স্থির থাকেননি। বিপ্লবের কথা প্রচার করেছেন। বিপ্লবকে সাহায্য করবার

জন্যে টাকা সংগ্রহ করেছেন। অত্যাচারী জার সরকারের কুৎসিত চেহারা সবার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরোতে লাগল সমস্ত বিদেশী সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানালেন, খুনি জারকে কেউ যেন একটি পয়সাও সাহায্য না করে।

আর আমেরিকায় থাকাকালেই তিনি লিখলেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস—'মা'। সরমভোর শ্রমিক এলাকার যেসব বিপ্লবী শ্রমিককে তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন তারাই হলো এই উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসের নায়ক পাভেল ও তার মাকে তিনি রক্তমাংসের চেহারায় দেখে এসেছেন। শ্রমিকদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কথা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কথা তিনি এমন ভাষায় লিখলেন যা তাঁর আগে আর কেউ লিখতে পারেনি।

জারের পুলিশ খ্যাপা কুকুরের মতো এই উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। গর্কির নামে আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো।

সুতরাং দেশে ফিরবার আশা ত্যাগ করে গর্কি চলে এলেন ইতালিতে। সেখানে ক্যাপ্রি দ্বীপে বাস করতে লাগলেন।

প্রায় সাত বছর তাঁকে থাকতে হয়েছিল এই দ্বীপে। ১৯১৩ সালে যখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন তিনি দেশে ফিরলেন।

১৯১৪ সালে শুরু হলো প্রথম মহাযুদ্ধ।

১৯০৫ সালের রক্তপাত যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। রুশদেশের শ্রমিকরা বিপ্লব করে জারকে তাড়িয়ে দিল সিংহাসন থেকে আর দেশের শাসনক্ষমতা তুলে নিল নিজেদের হাতে।

১৯২১ সালে গর্কির স্বাস্থ্য এত ভেঙে পড়ে যে তাঁকে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য বিদেশে যেতে হয়। আবার তিনি গেলেন ইতালিতে। দেশে ফিরলেন সাত বছর পরে ১৯২৮ সালে।

গর্কির বয়স তখন ষাট বছর। সারা দেশ তাঁকে বিপুল-ভাবে অভিনন্দন জানাল।

আর সেই ষাট বছর বয়সেও গর্কির অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রম-ক্ষমতা ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি একাধিক উপন্যাস ও নাটক এবং অজস্র প্রবন্ধ লিখলেন। অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তরুণ লেখকদের উপদেশ ও নির্দেশ দিতে লাগলেন। এককথায় তিনি হয়ে উঠলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহিত্য-জীবনের গুরু। তাঁর সঠিক পরিচালনা ছিল বলেই সেই সময়কার একাধিক তরুণ লেখক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। গর্কি ছিলেন বলেই মায়াকোভ্‌স্কি এত বড়ো কবি হতে পেরেছেন, আলেক্‌সি তলস্তয় হয়েছেন এত বড়ো ঔপন্যাসিক। গর্কি ছিলেন বলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের আধুনিক সাহিত্য এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি সমৃদ্ধ।

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুন আটষট্টি বছর বয়সে গর্কির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও তিনি বন্ধুবান্ধবদের বলেছেন : 'আমাকে আরো চারটি বই লিখতে হবে। প্রতি দুবছরে একটি বই। অর্থাৎ আরো আট বছর বাঁচতে হবে আমাকে।'

বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই আরো চারখানি অমর গ্রন্থ রচনা করে যেতে পারতেন। জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তাঁর কলম থামেনি। আর শুধু যে কলম থামেনি তা নয়, আটষট্টি বছর বয়সেও তাঁর প্রতিভা কিছুমাত্র স্তিমিত হয়নি। চব্বিশ বছরের যে তরুণ 'মাকার চুদ্রা' গল্পটি লিখে সাহিত্যের পথে যাত্রা শুরু করেছিল—চুয়াল্লিশ বছর পরেও তার তারুণ্য তেমনি অক্ষুণ্ণ ছিল। বরং চুয়াল্লিশ বছর পরে এই তারুণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পরিণত চিন্তা ও বিপুল অভিজ্ঞতা। ম্যাক্সিম গর্কির সারা জীবনটাই হচ্ছে একটানা এগিয়ে যাওয়া। যেমন-তেমন ভাবে নয়, প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ফুলের এক-একটি পাপড়ি খোলার মতো নিজের নতুনতর রূপ প্রকাশ করেছেন। আটষট্টি বছর বয়সেও এই আশ্চর্য ফুলটি দল মেলে চলেছিল। এমন প্রচণ্ড জীবনীশক্তি এ-যুগের পক্ষে রীতিমতো এক বিস্ময়।

এক নজরে

১৮৬৮—ম্যাক্সিম গর্কির জন্ম।

১৮৭২—বাবার মৃত্যু।

১৮৭৮—মায়ের মৃত্যু; গর্কির গৃহত্যাগ।

১৮৮০-১৮৮২—শিক্ষানবিশি।

১৮৮৪—কাজান শহরে প্রথমে বেকার অবস্থায় ঘোরাঘুরি, তারপরে এক রুটির কারখানায় চাকরি।

১৮৮৮—বিপ্লবী কাজে আত্মনিয়োগ। রুটির কারখানায় কাজ ও রাতপাহারাদারের কাজ।

১৮৮৯—প্রথম গ্রেপ্তার; মুক্তির পরে পর্যটকের জীবন।

১৮৯২—প্রথম গল্প 'মাকার চুদ্রা'।

১৮৯২-১৮৯৮—প্রচুর ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনা, উল্লেখযোগ্য রচনা—'অভাগা পল', 'বুড়ি ইজেরগিল', 'আমার পথের সঙ্গী', ইত্যাদি; ১৮৯৬ সালে ক্রিমিয়ায় আগমন; এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা—'মাল্‌ভা', 'কমরেড', ইত্যাদি।

১৮৯৮—দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার; মুক্তির পরে নজরবন্দী অবস্থা। দুই খণ্ডে পুস্তকাকারে রচনাবলীর প্রকাশ। বিপুল খ্যাতি।

১৮৯৯—উল্লেখযোগ্য রচনা—'ফোমা গর্দিয়েভ', 'ছাব্বিশজন পুরুষ ও একটি মেয়ে', ইত্যাদি।

১৯০০—উল্লেখযোগ্য রচনা—'তাদেরই তিনজন'।

১৯০১—মিমিওগ্রাফ যন্ত্রে ছাপানো আবেদন প্রচার করার অপরাধে তৃতীয় বার গ্রেপ্তার। উল্লেখযোগ্য রচনা—'ঝোড়ো পাখির গান'।

১৯০২—আর্জামাস-এ নির্বাসন। 'নিচুতলার আঁধারে' ও 'ফিলিস্টিন'

নাটক রচনা।

১৯০৪—'সামার ফোক' নাটক রচনা।

১৯০৫—চতুর্থবার গ্রেপ্তার। জনমতের চাপে মুক্তি। অজস্র রচনা।

১৯০৬—আমেরিকায় আগমন। আমেরিকা থেকে ইতালিতে। উল্লেখযোগ্য রচনা—'পীতদানবের দেশে', 'সাক্ষাৎকার' ইত্যাদি।

১৯০৭—লণ্ডনে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। উল্লেখযোগ্য রচনা 'মা', '৯ জানুয়ারি', ইত্যাদি।

১৯০৮-১৯১৩—ইতালিতে অবস্থান। অজস্র রচনা। উল্লেখযোগ্য রচনা—'নবজাতক', 'ইতালীয় কাহিনী', 'রুশীয় কাহিনী', 'আমার ছেলেবেলা' ইত্যাদি। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন।

১৯১৫—আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা।

১৯১৬-১৯২২—'তলস্তয়ের স্মৃতি' ও চারটি নাটক রচনা।

১৯২৩—আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড রচন.

১৯২৪—উল্লেখযোগ্য রচনা—'লেনিনের সঙ্গে', ইত্যাদ।

১৯২৫—উল্লেখযোগ্য রচনা—'আর্তামানভ-কাহিনী', ইত্যাদি।

১৯২৭—উল্লেখযোগ্য রচনা—'ক্লিম সামগিনের জীবনী', ১ম খণ্ড, ইত্যাদি।

১৯৩০—উল্লেখযোগ্য রচনা—'ক্লিম সামগিনের জীবনী' ৩য় খণ্ড, ইত্যাদি।

১৯৩১-১৯৩৫—সাংবাদিকতার ধরনে প্রচুর প্রবন্ধ ও একাধিক নাটক রচনা। 'সংস্কৃতি ও জনসাধারণ' পুস্তকের প্রকাশ।

১৯৩৬—১৯ জুন ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু।